বিশ্বকথা সিরিজ—৫ নং গ্রন্থ

চীনদেশ, জনসেবক বিধানচন্দ্র, কবি জয়দেব প্রভৃতি

গ্রন্থপ্রণেতা ও 'শুকতারা' সম্পাদক

শ্রীমধুসূদন মজুমদার

প্রণীত

দেব সাহিত্য কুটীর

# সূচীপত্র



———

জাপান—

সবল চিরকালই দুর্বলকে করতে চায় পেষণ। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বিভিন্ন ইউরোপীয় শক্তি দুর্বল জাপানে এসে করে চড়াও। অপমানিত জাপ তরুণেরা কিন্তু তা' সহজভাবে গ্রহণ করলে না—নিজেদের অস্ত্র-বিজ্ঞানে পারদর্শী করে তুলবার জন্যে চালাল তারা আন্দোলন। এই আন্দোলনেরই একজন নেতা হলেন—হীরোবুমী ইতো।

প্রায় একশো বছর আগে বাঙ্গালী কবি বড় ক্ষোভে বলেছিলেন যে, অসভ্য জাপানও জেগে উঠেছে ; কিন্তু ভারত তবু ঘুমিয়ে আছে। অতি বড় সত্যি কথা—একশো বছর আগে জাপান ছিল পৃথিবীর অজ্ঞাত অখ্যাত বহু জাতেরই একটি। তার প্রতিবেশী চীন অবশ্যি হাজার হাজার বছর আগে থেকেই জগৎ-সভায় বিশেষ শ্রদ্ধার আসন লাভ করে আসছে। কিন্তু জাপানের ছিল না তেমন কোন মহান্ ঐতিহ্য অথবা কর্মশক্তি—যার বলে সে জগতের সামনে শ্রদ্ধা কুড়িয়ে নিতে পারে।

অথচ মাত্র একশো বছর, অথবা তারও অনেক কম সময়ের মধ্যেই জাপান একটি উন্নত জাতিতে পরিণত হল! আর একেবারে শুধু তাই নয়—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পশ্চিম ভূখণ্ডে হিটলারের জার্মানী যেমন হ'য়ে উঠেছিল, বিশ্বত্রাস তেমনি পূর্ব ভূখণ্ডে জাপানও এক বিরাট ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল। তার পূর্ব দিকে বিরাট আমেরিকা, পশ্চিমে রাসিয়া আর চীন—সবাইকে জাপান শত্রু করে তুলেছিল; আবার এদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য। এক কথায় বলতে পারি সমগ্র পৃথিবী তখন জাপানকে বেষ্টন করেছিল—আর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জাপান অকুতোভয়ে এগিয়ে চলেছিল তার স্বার্থসাধনে।

সদর্প আস্ফালনে জাপান ক্ষণে ক্ষণে কাঁপিয়ে তুলছিল মিত্রশক্তিকে। সমুদ্রের বুকে একটা দ্বীপ—বিরাট আকাশের বুকে একটা চাঁদের টুক্‌রোর মতই ক্ষুদ্র, কিন্তু উপেক্ষণীয় নয়—এই তো হল জাপান। কী অমিত-বিক্রম সে সঞ্চয় করেছিল এত অল্পকালের মধ্যেই—কিন্তু তা স্থায়ী হল না। তাসের ঘরের মতই ভেঙ্গে পড়ল মাটির বুকে! কথায় বলে—অতি বড় হয়ো নাকো ঝড়ে ভেঙ্গে যাবে! জাপানের পক্ষে কথাটি নিদারুণ সত্যি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ অঙ্কে জাপান সম্পূর্ণরূপে হয় পরাজিত।

জাপানের ইতিহাস বলতে বুঝায় গত একশো বছরের কাহিনী।

# জাপান

জাপান—নাম তার নিপ্পন বা দাই-নিপ্পন, 'সূর্যোদয়ের দেশ'। চীনরা বলত 'জি-পুন'—তারই জাপানী উচ্চারণ হল নিপ্পন, আর পাশ্চাত্ত্য এই জি-পুনকে করে নিয়েছে জাপান। কিন্তু আরও আগে জাপানের একটা নিজস্ব নাম ছিল—'ইয়ামাতো'। বহির্জগৎ আজও বলে জাপান—নিজের দেশে যদিও এ নাম চলে না।

গোলাকৃতি পৃথিবী—তার মধ্যে পূর্ব-পশ্চিম বলে কিছু নেই; তবু পরিচয়ের জন্যে একটা কিছু সংজ্ঞার প্রয়োজন। তাই জাপানকে বলা হয় 'সূর্যোদয়ের দেশ'—এখানেই প্রথম সবিতৃদেবের আবির্ভাব ঘটে। তারপর তাঁর সপ্তাশ্ব-বাহিত সোনার রথে চড়ে তিনি প্রদক্ষিণ করেন ভূমণ্ডল! পূর্ব দিক থেকে আলো ছড়িয়ে পড়ে পশ্চিমে—আরও পশ্চিমে। পূর্ব গোলার্ধের পূর্বতম প্রান্তে অবস্থিত জাপান—উপমা দিয়ে বলতে পারি 'প্রাচ্যের ব্রিটেন।'

উপমাটি একেবারে অযৌক্তিক নয়। ব্রিটেন যেমন মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটা দ্বীপের মধ্যে স্বীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিরাজ করছে, তেমনি বিরাজ করছে জাপান—মূল প্রাচ্য ভূখণ্ড থেকে অনতিদূরে প্রশান্ত মহাসমুদ্রের বুকে। আরও মিল আছে—ক্ষুদ্র দ্বীপবাসী হয়েও অর্ধ জগতের অধীশ্বর ছিল ব্রিটেন—তার বাহুবল, তার বিদ্যা, তার কর্মশক্তি দ্বারা সে দুনিয়া জয় করেছিল। জাপানও চেয়েছিল তাই। তারও ছিল

বাহুবল, তারও ছিল বিদ্যা আর কর্মশক্তি—সাম্রাজ্য-বিস্তারে সে-ও এগিয়েছিল অনেকটা ব্রিটেনের মতই। কিন্তু এক যাত্রায় হল পৃথক্ ফল। সমগ্র প্রাচ্য ভূখণ্ডে জাপানের সাম্রাজ্য-বিস্তারের আশা অঙ্কুরেই হল বিনষ্ট।

## অবস্থান ও বিস্তৃতি

প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে একটা দ্বীপ—একটা নয়, দুটো তিনটে, চারটে—হলো না, আরও গুণতে হবে—একশো, দু'শো, তিনশো—তবু নয়, এক হাজার, দু'হাজার, তিন হাজার, চার হাজার অথবা বলতে পারি অসংখ্য দ্বীপ নিয়ে হল জাপান, অথবা ভৌগোলিক পরিভাষায় জাপান দ্বীপপুঞ্জ। অসংখ্য দ্বীপের সমষ্টি নিয়ে জাপান তৈরী হলেও আসলে গুণবার মত দ্বীপ চারটে মাত্রই—হোক্কাইডো, হনসু, কিউস্যু এবং শিকোকু। তা' ছাড়া রিউকিউ দ্বীপপুঞ্জও জাপানের অন্তর্গত। অবশ্যি যুগে যুগে জাপানের আকৃতির পরিবর্তনও কম হয়নি—কখন বেড়েছে, কখন কমেছে।

১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে যখন জাপান বহির্বিশ্বের সঙ্গে ভালোভাবে পরিচিত হল, তখনকার সীমাই এখানে দেওয়া হল। তারপর যুদ্ধ করে করে সে তার সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল—দখল করেছিল শাখালিন, ফরমোজা, কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়া।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তো সে প্রায় সমগ্র পূর্ব-প্রাচ্যই দখল করে নিয়েছিল। সে সমস্তই জাপানী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হলেও তো আর জাপান নয়। তোমাদের বলব শুধু জাপানের কথা।

জাপানের মোট ভূখণ্ডের পরিমাণ প্রায় ১,৪৮,০০০ বর্গ-মাইলের মত। লোকসংখ্যা প্রায় ৭ কোটি। জাপানের যে আয়তন দেওয়া হল, তার মাত্র ৮ ভাগের এক ভাগ আবাদের যোগ্য— আর বাদবাকী সবই পার্বত্য-ভূমি, কিছু কিছু জলাভূমি এবং অরণ্যও অবশ্যি রয়েছে। পার্বত্য প্রদেশ জাপানে অনেকগুলো আগ্নেয়গিরি বর্তমান। তাদের কতক এখনো জীবন্ত, কতক বা মৃত। এতগুলো আগ্নেয়গিরি থাকার ফলে জাপানে ভূমিকম্প একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার জন্যে জাপানকে যদি আমরা 'ভূমিকম্পের দেশ' বলে অভিহিত করি, তবে নিশ্চয়ই ভুল বলা হবে না।

এই আগ্নেয়গিরিগুলোর মধ্যে ফুজিয়ামা প্রধান। মাঝে মাঝে এই আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত এবং ভূমিকম্পের ফলে জাপানের বুকে যে দুর্দৈব নেমে আসে, তার তুলনা দেওয়া চলে না। জাপানে আছে অনেক উষ্ণপ্রস্রবণ, অল্প কয়টা হ্রদ এবং কয়েকটা ছোট ছোট নদী। পার্বত্যদেশ বলেই নদীগুলোর সর্বত্র নাব্য বা নৌবাহনযোগ্য নয়। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত এবং ভূমিকম্প ছাড়াও জাপানকে আর একটা প্রাকৃতিক

দুর্যোগের কবলে পড়তে হয়—তা' হল টাইফুন বা সামুদ্রিক ঝড়। এর কবলে পড়েও জাপানকে অনেক ক্ষতি স্বীকার করতে হয়।

জাপানের অধিবাসীদের বলা হয় জাপানী—কিন্তু এই জাপানীরাই জাপানের আদি অধিবাসী নয়। অনেক অনেক আগে সাইবেরিয়া থেকে 'আইনু' নামে এক জাতের লোক জাপানে উপনিবেশ স্থাপন করে। তারা ক্রমশঃ উত্তর দিক্ থেকে জাপানের দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এই দক্ষিণ জাপান উত্তরাংশের তুলনায় অনেক আরামপ্রদ। ক্রমে আইনুরা জাপানের আদিবাসী গুহা-মানবদের তাড়িয়ে প্রায় সমস্ত দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

কিন্তু এদের রাজত্বও বেশিদিন টিকতে পারেনি। শীঘ্রই চীন, কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়া থেকে মঙ্গোলজাতীয় লোকেরা জাপানে এসে ভিড় জমাতে থাকে এবং আইনুদের ক্রমশঃই কোণঠাসা করতে আরম্ভ করে। একদিকে এই মঙ্গোলজাতি এবং অন্যদিক থেকে দক্ষিণ এসিয়ার মালয় জাতিও ক্রমশঃ জাপানে উপনিবেশ স্থাপন করতে শুরু করে। এদের চাপে পড়ে আইনুজাতি ক্রমশঃই হটে গেল। কিন্তু আইনুজাতি জাপান থেকে একেবারেই লুপ্ত হয়ে যায়নি। এখনও কিছু কিছু লোমশ আইনুজাতীয় লোক জাপানে দেখতে পাওয়া যায়—এদের সংখ্যা অবশ্যি খুবই নগণ্য। শান্তিপ্রিয় এই আইনুজাতির

লোকেরা উন্নতির জন্যে খুব ব্যগ্র নয়। মাছ ধরা ও শিকার করা —এই দু'টো প্রাচীন বৃত্তিকেই তারা আজও অবলম্বন করে রয়েছে।

পূর্ব-কথিত মঙ্গোল আর মালয়—এই দুটো জাতির সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে আজকের জাপানীরা। অবশ্যি এদের দেহে ছিটে-ফোঁটা আইনু-রক্ত থাকাও কিছু বিচিত্র নয়।

## প্রকৃতি

জাপানীদের দেহাকৃতি অতিশয় খর্ব—এমন কি চীনাদের চেয়েও। দেখতে অবশ্যি অনেকটা চীনাদের মত—হল্‌দে রং, খাঁদা নাক, ছোট চোখ, গোঁপ-দাড়িহীন মুখ আর একদম সোজা চুল। শৈশবে এরা অত সুন্দর দেখতে—বড় হলে ক্রমশঃই যেন আমাদের চোখে অতি বেখাপ্পা বলে মনে হয়। স্বভাবতঃ জাপানীরা অতিশয় আমুদে, বিলাসী এবং মেজাজী। আবার এরাই অত্যন্ত জেদী, কষ্টসহিষ্ণু এবং হিংসুটে। এই বিচিত্র ধরনের দোষ-গুণ এদের মধ্যে রয়েছে বলে অনেক সময় জাপানীদের ফরাসী ও স্পেনীয়দের সহিত তুলনা করা হয়ে থাকে। এরা একদিকে ফরাসীদের মত বিলাসী ও আমুদে, অন্যদিকে স্পেনীয়দের মত কষ্টসহিষ্ণু ও ভীষণ।

জাপানীদের আতিথ্যপরায়ণতা, শিষ্টাচার ও পরিচ্ছন্নতাবোধ

বিশ্ববিদিত। গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং আত্মত্যাগ—জাপানী চরিত্রের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। জাপানী চরিত্রে বিভিন্ন গুণের সমাবেশ ঘটেছে বলেই জাপান সমগ্র প্রাচ্যের শিরো-মণিরূপে পরিচয় দেবার সুযোগ পেয়েছিল। সমগ্র প্রাচ্যে আজ পর্যন্ত একমাত্র জাপানীরাই সর্বপ্রকারে পাশ্চাত্যের সম-কক্ষতা দাবী করতে পারে—এ থেকেই তাদের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে।
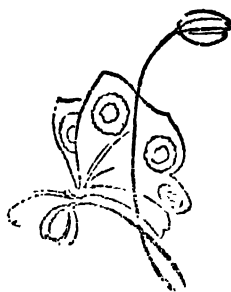
জাপানীদের মর্ত্যের দেবতা হ'ল—মিকাডো বা সম্রাট্। অতুলনীয় শ্রদ্ধার আসনে তারা বসিয়ে রেখেছে তাঁকে। প্রথম সম্রাট্ হলেন মুৎসিহিতো। তাঁর সময় থেকেই জাপানীদের জাতীয় জীবনে দেখা যায় নবযুগের সূচনা।

# ঐতিহাসিক পরিচয়

প্রাচ্যের উন্নত জাতি জাপান—কিন্তু তার কোন প্রাচীন মহান্ ঐতিহ্য নেই, ইতিহাস বলতেও তেমন কিছু নেই। জাপানীরা আড়াই হাজার বছর আগে থেকে যদিও একটা ইতিহাস দাঁড় করানোর চেষ্টা করে আসছে—কিন্তু তা' একান্ত ভাবে নির্ভরযোগ্য নয়। খাঁটি বিজ্ঞান-সম্মত ঐতিহাসিক মালমসলা পাওয়া যায় দ্বাদশ শতাব্দী থেকেই। অবশ্যি তারও কিছু কাল আগে পর্যন্ত যাওয়া যেতে পারে। যা' হোক, আমরা একেবারে গোড়া থেকে আরম্ভ করব।

জাপানীদের মতে তাদের ইতিহাস আরম্ভ হয় খ্রীষ্ট-পূর্ব ৬৬০ অব্দ থেকে। জাপানী পুরাণে উল্লিখিত প্রথম সম্রাট্ জিম্মুতেন্নো ঐ বছর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তারপর অনেককাল পর্যন্ত জাপানের ইতিহাসে রয়ে গেছে শূন্য পাতা। একটা প্রাচীন কাহিনীতে শুধু জানা যায় যে, খ্রীষ্টপূর্ব ২৮৬ অব্দে ফুজি পর্বতে অগ্ন্যুৎপাত হয় এবং তার ফলে জাপানের প্রসিদ্ধ হ্রদ 'বিওয়া'-র সৃষ্টি হয়। আবার কয়েক শ' বছর পর্যন্ত কিছুই জানা যায় না। তারপর খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকের গোড়ার দিকে পাওয়া যাচ্ছে এক জাপান সম্রাজ্ঞীর নাম—'জিঙ্গো'।

তিনিই প্রথম কোরিয়া আক্রমণ করেন। জিঙ্গোর সৈন্যবাহিনীকে দেখেই নাকি কোরিয়ার সম্রাট্ ভয়ে আঁৎকে উঠেছিলেন।

পরবর্তী শতকে চীনারা এবং কোরিয়ানরা দলে দলে জাপানে উপনিবেশ স্থাপন করতে থাকে। এদের আগমনে, বিশেষতঃ চীনাদের আগমনে, জাপানের নানাদিকে বৈষয়িক উন্নতি দেখা যেতে লাগল। সে সময়ে চীনারা সভ্যতার অগ্রদূত ছিল। কাজেই তারা জাপানকেও দেখাল পথ। জাপান পেল আলোর সন্ধান। খাল কাটা, রাস্তা তৈরী করা এবং ছোট-খাটো যন্ত্রের সহায়তায় বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সুরু হল এ যুগেই। চীনাদের অনুকরণে জাপানের রাজনৈতিক কাঠামো তৈরী হল।

সেই সময়ের য়ুরোপ যেমন আগ্রহ ও নিষ্ঠাসহকারে গ্রীক ও রোমীয় সভ্যতার অনুকরণে ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল, তেমনি জাপানও অনুসরণ করতে লাগল চীনকে। চীনের আচার-ব্যবহার, তাদের চাল-চলন, পোশাক-পরিচ্ছদ—সব কিছুই জাপানীদের নিকট বিশেষভাবে আদৃত এবং গৃহীত হতে লাগল। এই ভাবে কয়েক শতাব্দী চলবার পর যখন চীন ও কোরিয়া থেকে বৌদ্ধধর্ম এল জাপানে, তখন জাপানের একটা প্রকৃত বৈশিষ্ট্য দেখা দিল। বৌদ্ধধর্মের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে জাপানের জাতীয় জীবনে জাগল সাড়া—তাদের ইতিহাসও সুরু হল।

এর মধ্যে জাপানে দু'টো ঘটনা ঘটে গেছে, তা' উল্লেখ করবার যোগ্য। ৪১৬ খ্রীষ্টাব্দে জাপানে যে সাংঘাতিক ভূমিকম্প দেখা দেয়, তাই জাপানের প্রামাণিক সূত্রে গৃহীত প্রথম ভূমিকম্প। ৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ভূমিকম্পে জাপানের ইয়ামাতো প্রদেশ সাংঘাতিকরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতকে কোরিয়া থেকে বৌদ্ধধর্ম এল জাপানে। পূর্বেই বলেছি, বৌদ্ধধর্মের আগমনেই জাপানে নবযুগের সৃষ্টি হল। জাপানীরা আগেই চীনা অক্ষর গ্রহণ করেছিল। এক্ষণে বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে অতিরিক্ত আগ্রহের জন্যে জাপানীরা চীনা সাহিত্য পড়তে আরম্ভ করল। ফলে, অল্প সময়ের মধ্যেই জাপানের জাতীয় জীবনে চীনের প্রভাব সুদূরপ্রসারী হয়ে উঠল। জাপানের নিজস্ব প্রতিভা ছিল, তার সঙ্গে চীনের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি যুক্ত হবার ফলে জাপানীরা অতি অল্পকালের মধ্যেই শিক্ষা-সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকে চীনাদেরও ছাড়িয়ে গেল। তারা গোড়াতেই চীনাদের অনুকরণে রাজ্যশাসন-প্রণালীর মধ্যে পরিবর্তন আনল।

এর ফলে জাপানে শোজা-পরিবারের প্রাধান্য লুপ্ত হল। দরবারের অনুষ্ঠান, রাজকীয় উপাধি, আইন-কানুন, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক-প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সমস্ত কিছুর উপরই চীনা প্রভাব

বিস্তৃত হল। আগেই বলেছি জাপানীরা চীনাদের নিকট থেকে যা' কিছু গ্রহণ করেছে, তাকেই স্বীয় প্রতিভার সাহায্যে বিশিষ্ট রূপ দান করেছে। যে বৌদ্ধধর্ম জাপানে নতুন যুগের সৃষ্টি করল, সেই বৌদ্ধধর্মও ঠিক চীনাদের বৌদ্ধধর্ম নয়। বৌদ্ধধর্মের আগমনের পূর্বে জাপানে যে শিন্তোধর্ম বর্তমান ছিল, বৌদ্ধধর্ম সেই শিন্তোধর্মকে বিনষ্ট করেনি, পরন্তু বৌদ্ধধর্ম ও শিন্তোধর্ম পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক হয়ে রইল।

## ঐতিহাসিক যুগের আরম্ভ

জাপানের রাজা 'মিকাডো'—তিনি দেবতার বংশধর বলে পূজিত হয়ে থাকেন। তাঁর ক্ষমতা সার্বভৌম—কিন্তু তথাপি এই রাজাদের কাহিনী বল্লেই কিন্তু জাপানের ইতিহাস সম্পূর্ণ হবে না। কারণ মিকাডো নামে সর্বশক্তিমান্ হলেও জাপানে কয়েকটি বড় পরিবার আছে—যাদের ক্ষমতা প্রকৃতই অপ্রতিহত। রাজ্যের সর্বপ্রকার বিধিব্যবস্থায় এদের প্রভাব অসাধারণ। তাই জাপানী সম্রাট্‌দের ইতিহাস বর্ণনা-প্রসঙ্গে এই পরিবারগুলো সম্বন্ধেও কিছুটা বলে নিতে হবে।

রাজা সার্বভৌম হলেও তিনি শাসনকার্যের সুবিধার জন্যে অতি প্রাচীনকালেই কয়েকটি বিশিষ্ট পরিবারকে প্রভূত সম্পত্তি

এবং ক্ষমতা দান করেছিলেন। তাঁরা বংশানুক্রমিকভাবে এই সমস্ত সম্পত্তি ও ক্ষমতা ভোগ-দখল করতেন ; এমন কি তাঁদের রাজকীয় পদগুলি পর্যন্ত ছিল পুরুষানুক্রমিক—যেমন রাজার ছেলে রাজা হয়, তেমনি জাপানে সেনাপতিরও ছেলে সেনাপতি, মন্ত্রীরও ছেলে মন্ত্রী—ঐরকম হত।

রাজাকে দেবতার বংশধর বলা হত—এবং এই কারণেই জনসাধারণের সঙ্গে তাঁর কোন প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না। প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী ঐ জমিদাররা ছিল প্রকৃতপক্ষে প্রজাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। এ হেন ক্ষমতার অধিকারী বলেই ঐ বিশিষ্ট পরিবারগুলোর মধ্যে ক্ষমতা নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। সে এক বছর বা দু'বছরের কাহিনী নয়—এ হল জাপানের রাজনৈতিক ইতিহাসের কয়েক শতাব্দীর কাহিনী।

তখন সমাজের নিম্নস্তরের লোকদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়—প্রকৃতপক্ষে ভূমিদাসদের চেয়ে ভালো-কিছু নয়। কিন্তু প্রথমতঃ কন্‌ফুসিয়সের নীতিধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম এবং দ্বিতীয়তঃ চীনা সভ্যতা—এ দু'য়ের প্রভাবে পড়েই সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি নাগাদ সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে একটা বিপ্লব দেখা দিল। যে বিশিষ্ট কয়টি অভিজাত পরিবার ক্ষমতার উচ্চ-শিখরে অধিষ্ঠিত থেকে সম্রাট্‌কে নামে মাত্র রেখে নিজেরাই করতেন দেশের শাসন ও শোষণ, তাঁদের প্রাধান্য লোপ করা হল এবং প্রকৃতপক্ষে সম্রাটের অধীনে একটি কেন্দ্রীয় সরকার

প্রতিষ্ঠিত হল। দেশের সমস্ত সম্পত্তি সম্রাটের অধীনে এনে এদের পুনর্বণ্টন-ব্যবস্থা হল।

কিন্তু এই অবস্থাও বেশী দিন স্থায়ী হল না। শীঘ্রই আবার অভিজাত সম্প্রদায় মাথা তুলে দাঁড়ালেন এবং আবার নতুন করে ক্ষমতার জন্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। প্রতিদ্বন্দ্বী দল-গুলির মধ্যে এবার প্রাধান্য লাভ করলেন ফুজিওয়ারা পরিবার এবং পরবর্তী তিন শতাব্দী কাল চলল তাঁদেরই শাসন অব্যাহত ভাবে। তা' হলেও দীর্ঘকাল পর্যন্ত ক্ষমতার উৎস ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের হাতেই—প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের নিয়োগ করা হত কয়েক বছরের চুক্তিতে। তখনও পর্যন্ত জাপানে জাতিভেদ ততটা গড়ে উঠেনি। সমগ্র সমাজে ছিল দু'টো জাত—একটা অভিজাত সম্প্রদায় বা দেববংশ, অপর জনসাধারণ।

এর পর থেকেই সমাজে নূতন ধরনের আর একটা শ্রেণী গড়ে উঠল—এরা হল সেনানী বা জাপানীদের ভাষায় 'সামুরাই'। মঙ্গোল ও মালয়দের আসবার পর স্থানীয় অধিবাসী আইনুদের ক্রমেই হটিয়ে দেবার চেষ্টা চলে। আইনুরা কিন্তু সহজে ভূমির দখল ছাড়তে চায়নি। কাজেই তাদের উপর জোর-জুলুম চলল। রাজধানী থেকে দূরে কেন্দ্রীয় সৈন্য পাঠানোর বিশেষ সুযোগ না থাকায় সেই সমস্ত স্থানে আপনা থেকে গড়ে উঠল স্থানীয় সৈন্যবাহিনী। এরা আইনুদের তাড়িয়ে যে সমস্ত জায়গা অধিকার করল, তাদের উপর এদের

নিষ্কর আধিপত্য প্রদান করা হল—এভাবেই জাপানের অন্যতম প্রধান সামুরাইদের সৃষ্টি।

এইভাবে তৎকালে জাপানে যে বিশেষ চারটি শ্রেণী গড়ে ওঠে—তারা হল—(১) সামুরাই বা সেনানী, (২) কৃষক, ..(৩) শিল্পী ও (৪) বণিক্‌। এই বিভাগের ভিত্তি নিঃসন্দেহে চীনাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল, কিন্তু তা' বলে নতুনত্বও এর মধ্যে কম নেই। চীনের সমাজে বণিকদের যে প্রাধান্য ছিল, জাপানে তা' লুপ্ত হল এবং সেই প্রাধান্য বর্তাল সেনানীদের উপর। সামুরাই-রা জন্মগত কোন আভিজাত্য দাবী করে না। তারা জাপানের অগণিত জনসাধারণেরই অঙ্গ ছিল—কিন্তু আকস্মিকভাবেই একটা নতুন শ্রেণীতে পরিবর্তিত হল। জাপানী ইতিহাসের সাত শতাব্দী কাল এই সামুরাই-দের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছিল।

সন, তারিখ নিয়ে ইতিহাস—কিন্তু জাপানী ইতিহাসের এই দীর্ঘ সাত শতাব্দী কালের কোন প্রামাণিক উপাদান পাওয়া যায়নি বলে সন, তারিখ আর বিশিষ্ট লোকদের নাড়ী-নক্ষত্রের সন্ধান নেওয়াও সম্ভবপর হয়নি। মোটামুটিভাবে ইতিহাসের গতি ও প্রকৃতি নিয়েই আলোচনা করা গেল। অতঃপর খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী থেকেই সুরু হবে জাপানের প্রকৃত ইতিহাস—সে কথা আগেই বলা হয়েছে।

আপাততঃ এই অন্তর্বর্তী কালের যে ছিন্নবিচ্ছিন্ন দু'-একটা ঐতিহাসিক উপাদান পাওয়া গেছে, তারই উল্লেখ করব।

৬১০ খ্রীষ্টাব্দে জাপানে একবার লোক গণনা করা হয়—লোক-সংখ্যা ছিল মাত্র পঞ্চাশ লক্ষের কাছাকাছি।

৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দের এক ভূমিকম্পে জাপানের ভূমিখণ্ডে নাম-পরিবর্তন দেখা যায়। ৬৮১ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট্ তেম্মু বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণের পোশাক-পরিচ্ছদের একটা মান নির্ণয় করেন। এই কালেই অনেক নতুন আইন-কানুন বিধিবদ্ধ হয়। ৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে লোক-গণনায় দেখা যায় জাপানের লোক-সংখ্যা বেড়ে প্রায় নব্বই লক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ৭৭০-৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে কৃষক শ্রেণীর আধিপত্য সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হল এবং সামুরাইদের প্রভাব সুরু হল।

৯০০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে বৌদ্ধধর্ম দৃঢ়ভাবে জাপানে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ৯০০-১১০০ খ্রীষ্টাব্দে পূর্বকথিত ফুজিওয়ারা পরিবারের প্রাধান্য একেবারেই লোপ পেয়ে গেছে। এর পরিবর্তে তায়রা পরিবার ক্ষমতা হস্তগত করে। এদিকে আবার মিনামোতো পরিবারও সামরিক ক্ষমতা হস্তগত করে তায়রার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই দুই শতাব্দী কাল প্রতিদ্বন্দ্বী দু'টি দলের মধ্যে ভীষণ রেষারেষি চলে এবং বস্তুতঃ এদের দ্বারাই তখন সমগ্র দেশ শাসিত
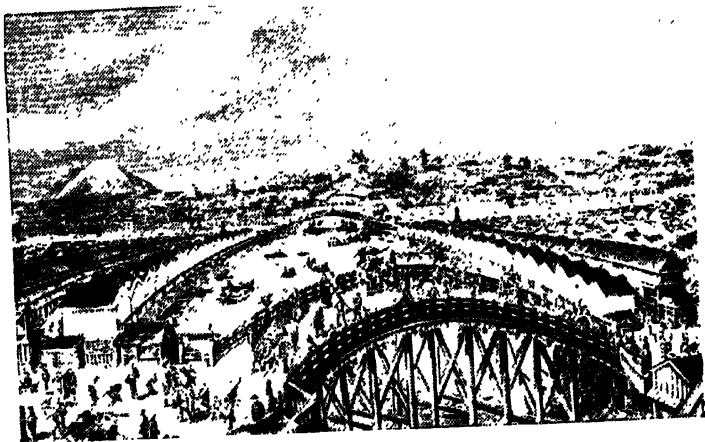
পুরাতন স্থান দেয় নতুনকে গড়ে উঠতে। বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শহর, বিচিত্র শোভা-সম্পদে সমৃদ্ধ আজকের টোকিওই একদিন দেখতে ছিল সম্পূর্ণ সরল নিরাভরণ।
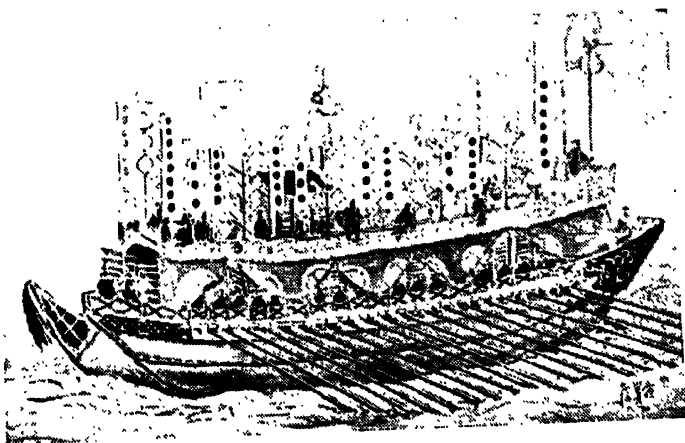
স্থলযুদ্ধের ন্যায় জলযুদ্ধেও জাপানীরা ছিল সুনিপুণ। শোগান-যুগের এই যুদ্ধ-জাহাজই তার নিদর্শন। এ জাহাজ যেমন ছিল দুর্ভেদ্য, তেমনি ছিল কার্যক্ষম।

হত। দু'টি প্রতিদ্বন্দ্বী দলের পক্ষ সমর্থন করে সমগ্র দেশই এক সাংঘাতিক গৃহযুদ্ধে মেতে উঠল।

বৌদ্ধধর্ম ও চীনা সভ্যতা যখন জাপানে এসে পৌঁছল, তখনই শোজাদের পতন হয়েছিল—এ কথা আগেই বলা হয়েছে। শোজা পরিবারের পতনের সঙ্গে সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করে ফুজিওয়ারা পরিবার। রাজ্যের বিভিন্ন দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত হল ফুজিওয়ারা পরিবারের লোকেরা। তিন শতাব্দী কাল এদেরই শাসন চলছিল নিরঙ্কুশভাবে। কিন্তু পাশার গুটি উল্টাল—জাপানে সামরিক শ্রেণীর অভ্যুদয়ে এদেরও পতন হল। দ্বাদশ শতকের শেষ দিকে দু'টি প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী পরিবার আত্মপ্রকাশ করে এবং ক্ষমতার লোভে উভয়েই মরিয়া হয়ে ওঠে। এদের নামও পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। ফুজিওয়ারা-রা রাজার উপর প্রভাব বিস্তার করে যে ক্ষমতা হস্তগত করেছিল, তায়রা পরিবার ১১৫৯ খ্রীষ্টাব্দে অস্ত্রের সাহায্যে সেই ক্ষমতা লাভ করল।

কিন্তু তাদের প্রাধান্যও বজায় রইল মাত্র স্বল্পকাল—১১৮৫ খ্রীষ্টাব্দে মিনামোতো বংশ প্রবল হয়ে তায়রাদের হাত থেকে ক্ষমতা অধিকার করে নিলে এবং তা' তারা বজায় রাখলে দীর্ঘকাল। খ্রীষ্টীয় উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত জাপানের প্রকৃত হর্তাকর্তা ছিল মিনামোতো বংশ। মিনামোতোরা ক্ষমতা হস্তগত করবার পর তাদের

নেতা যোরিতোমো 'সেয়ি-ই-তাই-শোগান' উপাধি নিয়ে দেশের প্রকৃত শাসনকর্তা হয়ে বসলেন। আইনুদের হটিয়ে দেবার ব্যাপারে তাঁর উৎসাহের আর অন্ত ছিল না।

দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্বেও জাপান-সম্রাটের বিশেষ কোন ক্ষমতা ছিল না। অবশ্যি শুধু একবারই অল্পকালের জন্যে সম্রাটের হাতে সমস্ত ক্ষমতা এসে গিয়েছিল। কিন্তু মিনামোতোদের হাতে ক্ষমতা আসবার পর সম্রাট্ একেবারেই ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে নামে-মাত্র প্রধান হয়ে রইলেন। অতঃপর মিনামোতো বংশের নেতারাই শোগান উপাধি নিয়ে জাপান শাসন করতে লাগলেন। জাপানে এক ধরনের দ্বৈত শাসন চলতে লাগল। এই শোগানগণ জাপ-সম্রাটের নিকট আনুগত্য প্রকাশ করতেন এবং সম্রাট্ কর্তৃকই নিযুক্ত হতেন; কিন্তু আসলে তাঁরাই ছিলেন সর্বেসবা। যোরিতোমো তাঁর পৈতৃক বাসভূমি কামাকুরায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন।

সম্রাট্ অবশ্যি পূর্ববৎ ফিয়োতো-তেই থেকে গেলেন। জাপানের রাজধানী পরে অবশ্য আরও সরে গেল—এল যেদো-তে। এই যেদো-ই আধুনিক যুগের বিশ্ববিখ্যাত জাপ-রাজধানী টোকিও।

## চীনা আক্রমণ

যোরিতোমোর মৃত্যুর পর তাঁর দুই পুত্র যোরাইয়ে এবং মনোতোমো পর্যায়-ক্রমে শোগান উপাধি লাভ করেন। ১২১৯ খ্রীষ্টাব্দে যোরাইয়ের পুত্র কর্তৃক মনোতোমো নিহত হন। মোনো-তোমোর কোন পুত্র না থাকায় মিনামোতো বংশের প্রধান শাখার আধিপত্য এখানেই শেষ হল। হোজো-পরিবার ছিল মিনামোতোদেরই ঘনিষ্ঠ সমর্থক এবং এখন থেকে এদের আধিপত্য হল সুরু। ১২২৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৩৩৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চলে হোজোদের প্রাধান্য ও শাসন।

এদের শাসনকালেই উপর্যুপরি দু'বার জাপানের উপর আক্রমণ চলে। ১২৭৫ খ্রীষ্টাব্দ ও তার সাত বৎসর পর চীনা সৈন্যবাহিনী জাপান আক্রমণ করে কিইস্যু-র উপকূলে অবতরণ করে। কিন্তু এদের এই দুটো অভিযানই ব্যর্থ হল। এর কিছুকাল আগেই চীনের যুয়েন বংশের প্রতিষ্ঠাতা কুবলাই খাঁ জাপানকে অধীনতা স্বীকার করবার জন্যে সংবাদ পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু কোন সাড়া না পেয়ে তিনি পূর্বোক্ত তারিখে জাপানের বিরুদ্ধে বিরাট সৈন্যদল প্রেরণ করেন, কিন্তু ব্যর্থ হলেন—এবং দীর্ঘকাল আর চীনা-মঙ্গোলরা জাপান আক্রমণ করতে সাহস পায়নি।

১৩৩১ খ্রীষ্টাব্দে হোজোবংশের সমাপ্তি কালে সম্রাটের

উত্তরাধিকারত্ব নিয়ে এক সমস্যা দেখা দেয় এবং ঐ সময় থেকে ১৩৯২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত উত্তরে ও দক্ষিণে যুগপৎ দু'টি দরবার গড়ে ওঠে। অবশেষে দক্ষিণের রাজবংশ সাম্রাজ্যিক অধিকার প্রদান করেন সম্রাট্ গো কোমাৎস্থকে এবং তখন থেকে তিনিই হলেন প্রকৃত মিকাডো।

ওদিকে হোজোবংশের পতনের পর আশিকাগা শোগানরা ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শাসনকার্য চালিয়ে গেলেন। তাদের শাসন-কালেই পূর্বোক্ত সম্রাটের উত্তরাধিকারিত্ব নিয়ে গোলযোগ ও গৃহযুদ্ধ দেখা দেয়। আশিকাগা শোগানরা শাসক হিসাবে খুব সাফল্যলাভ করতে পারেন নি। এই বংশের শেষ শোগান তো ছিলেন একটি মূর্তিমান অপদার্থ। ফলে দেশের শাসনভার পর পর দু'জন সামরিক নেতার হাতে গিয়ে পড়ল। এরা হলেন যথাক্রমে নোবুনাগা ও হিদেযোশী। এঁদের কেউ কিন্তু শোগান উপাধি গ্রহণ করেন নি। সেনাপতি হিদেযোশীর শাসনকালেই জাপানী সৈন্যদল কোরিয়ায় অভিযান চালিয়েছিল। উভয় পক্ষের যুদ্ধ চলেছিল ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ছয় বছর ধরে। কিন্তু যুদ্ধ সমাপ্তির পূর্বেই হিদেযোশীর মৃত্যু হল এবং শুরু হল ইযেযাস্থর শাসন। ইযেযাস্থ হলেন তোকুগাওয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা। আড়াইশো বছরেরও অধিক-কাল চলে তোকুগাওয়া বংশের রাজত্ব—১৬০৩ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দ যোশীনবুর পদত্যাগ পর্যন্ত।
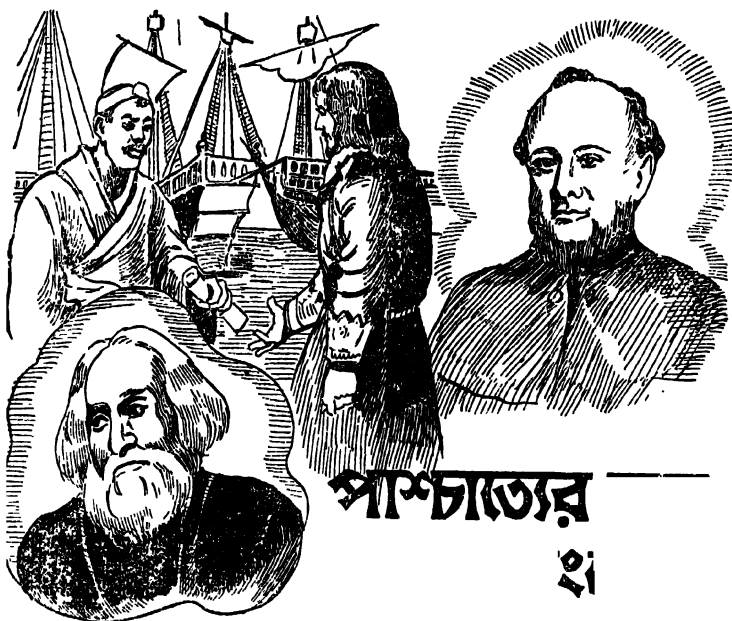
# পাশ্চাত্যের

জাপানের ইতিহাসে আমরা ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত এগিয়ে এসেছি। কিন্তু এরি মধ্যেই যে জাপানের উন্নতির বীজটুকু বপন করা হয়েছে কোথায় এবং কী ভাবে, তার উল্লেখ এখনও পর্যন্ত করা হয়নি। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, জাপান পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করেই বিশ্বের দরবারে নিজের প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিল। কী ভাবে পাশ্চাত্যের সম্পর্কে এল জাপান, এখন সেই কাহিনীই তোমাদের বলব।

চীনে যুয়েন বংশের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট্ কুবলাই খাঁর নাম বলেছি—মনে আছে তো? সেই কুবলাই খাঁর দরবারে

এসেছিলেন এক য়ুরোপীয় লেখক—নাম তার মার্কো পোলো। তিনি চীনে অবস্থান করেন ১২৭৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১২৯২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। মার্কো পোলো দেশে ফিরে গিয়ে এক বিরাট ভ্রমণকাহিনী রচনা করেন—তাতে জাপান সম্বন্ধেও বিস্তৃত উল্লেখ ছিল। মার্কো পোলো জাপানের ধনরত্ন সম্বন্ধে অবিশ্বাস্য রকম অত্যুক্তি করেছিলেন। তারই ফলে য়ুরোপীয়দের দৃষ্টি পড়ল প্রাচ্যের দিকে। কিন্তু তা' সত্ত্বেও দীর্ঘকাল পর্যন্ত জাপান য়ুরোপীয়গণ কর্তৃক প্রায় অনাবিষ্কৃতই থেকে গেল।

১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম পর্তুগীজদের একটা বাণিজ্য জাহাজ এসে ভিড়ল জাপানের উপকূলে। ১৫৪৯ খ্রীষ্টাব্দে জেসুইট মিসনারী পাদ্রী জেভিয়ার৷ এলেন জাপানে। প্রথমে তিনি খুব সমাদরের সঙ্গে গৃহীত হলেও পরে রাজা এক অনুশাসন দ্বারা জাপানীদের নূতন ধর্ম গ্রহণে বাধা দিলেন। অতঃপর জেভিয়ারা স্থান পরিবর্তন করলেন এবং নূতন স্থানেও সাদরে গৃহীত হলেন। ক্রমে মিসনারীদের সংখ্যা প্রতিপত্তি উভয়েই সমানে বাড়তে লাগল। অবশেষে ১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট্ মিসনারীদের নির্বাসিত করে এক দণ্ডাজ্ঞা প্রচার করলেন। কিন্তু রাজপুত্রদের মধ্যে কেউ কেউ ইতিমধ্যে খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করায় এবং আরও অনেকে বাধা দেবার ফলে এই আদেশ আর শেষ পর্যন্ত পালিত হল না।

ইতিমধ্যে পর্তুগীজদের অনুসরণ করে ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে

ওলন্দাজদের একটা দলও জাপানে এসে পৌঁছাল। পর্তুগীজ পাদ্রীরা কিন্তু এদের সুনজরে দেখতে পারল না। তারা এই নবাগতদের প্রতি কঠোর দণ্ড বিধান করবার জন্যে সম্রাট্‌কে ক্রমাগতই উত্তেজিত করতে লাগল। কিন্তু সম্রাট্‌ ওদের কোন ক্ষতিই করেন নি। পরবর্তী কয়েক বছর ওলন্দাজ ও ইংরেজদের আগমন বেড়ে গেল। কিন্তু ওলন্দাজদের অত্যাচারে সেখানে ইংরেজরাও তিষ্ঠাতে পারল না! ফলে উনিশ শতক পর্যন্ত জাপানে ওলন্দাজদের একচেটে বাণিজ্য চলল। পর্তুগীজ পাদ্রীরা অনেক জাপানীকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করেছিল। পর্তুগীজদের শত্রুরা সম্রাট্‌কে নানাভাবে পর্তু-গীজদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলছিল। ফলে পর্তুগীজ মিসনারী ও নবদীক্ষিত খ্রীষ্টানদের উপর মাঝে মাঝেই অত্যাচার চলছিল।

১৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দে অকস্মাৎ একটি জেলার ত্রিশ হাজার খ্রীস্টান বিদ্রোহী হয়ে উঠে। জাপ সৈন্যদল ওদের সবাইকে হত্যা করে। খ্রীষ্টানদের এই বিদ্রোহ শিমাবারা বিদ্রোহ নামে জাপানী ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। এই বিদ্রোহের ফলে শাসনকর্তাদের মনে ধারণা জাগল যে, এর পশ্চাতে রয়েছে পর্তুগীজ মিসনারীদল। ফলে ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে এক রাজ-কীয় অনুশাসনের বলে সমস্ত পর্তুগীজকে জাপান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল এবং যে কোন জাপানীর পক্ষেই বিদেশ গমন

নিষিদ্ধ হল। তাই বলা হয়েছে যে, ওলন্দাজগণ অতঃপর দীর্ঘকাল জাপানে ব্যবসার একচেটে অধিকার পেল। অবশ্যি চীনারা তো অনেক আগে থেকেই ছিল। ফলতঃ চীনা এবং ওলন্দাজ ছাড়া অপর কোনও বিদেশীর পক্ষে জাপানের কূলে অবতরণই সম্ভব ছিল না।

কিন্তু জাপান বহির্জগতের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দেবার চেষ্টা করলে কী হবে—জাপানের নিকটতম প্রতিবেশী রুস আর আমেরিকানদের পক্ষে জাপানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজন দেখা দিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরু থেকেই রুসীয়দের দৃষ্টি পড়ল জাপানের উপর। রুসীয়গণ তাদের রাজ্যসীমা ক্রমশঃই পূর্ব দিকে বাড়িয়ে আসছিল। জাপানীদের বিরোধিতা সত্ত্বেও কিন্তু রুসীয়দের কিছু কিছু প্রভাব এই অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ছিল। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে এক রুসদূত জাপানে আগমন করেন। এর পর দুয়েকটি আমেরিকান জাহাজও জাপানের নাগাশাকি বন্দরে নোঙর করে। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় রুসীয় রাজদূত জাপান আগমন করেন।

ওদিকে আমেরিকানরা তিমি শিকারের জন্যে জাপানের কাছাকাছি সমুদ্রে ঘোরাফিরি করত। তাদের মাছ শিকারের এবং চীনের সঙ্গে যোগ রক্ষার সুবিধের জন্যে জাপানের উপকূলে জাহাজে কয়লা বোঝাই করবার প্রয়োজন দেখা

জাপানের ইতিহাসে শোগান-যুগ প্রগতির পথকে নানাভাবে করে দেয় উন্মুক্ত। 'শোগান' শব্দের অর্থ 'প্রধান সেনাপতি'। যোরিতোমো নামে এক ব্যক্তি খুব শক্তিশালী হয়ে উঠলে সম্রাট তাঁকে এই উপাধিতে ভূষিত করেন।

দিল। এই উদ্দেশ্যে আমেরিকান সরকার ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম জাপানের সঙ্গে যোগ স্থাপন করবার জন্যে চেষ্টা করে, কিন্তু সাফল্য অর্জন করতে পারে নি। এর আট বছর পর ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে কমোডোর প্যেরী আমেরিকার প্রেসিডেণ্টের পক্ষ থেকে জাপ-সম্রাটের সঙ্গে এক সন্ধি-পত্রে স্বাক্ষর করেন। প্রকৃতপক্ষে এই সময় থেকেই আধুনিক জাপানের ইতিহাস শুরু হল।

কমোডোর প্যেরীর পক্ষে জাপানের সঙ্গে যোগস্থাপন খুব সহজ হয়নি—কিন্তু একবার যখন বাধা অপসৃত হল তখন পাশ্চাত্যের অন্যান্য জাতিও সেই সুযোগ গ্রহণ করল। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার সঙ্গে জাপানের অনাক্রমণ ও বাণিজ্যিক চুক্তি সাধিত হল। সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ, ওলন্দাজ এবং রুশীয়দের

সঙ্গেও অনুরূপ চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। পরে এর সঙ্গে আবার যুক্ত হল ফ্রান্সও। অবশ্যি এতে বিদেশী শক্তিগুলো জাপানে কোন অবাধ অধিকার পেল না। বাণিজ্য ব্যবস্থা এবং চলাচলের উদ্দেশেও তাদের জন্যে একটা বাঁধা-ধরা সীমা রচনা করে দেওয়া হল। এর বাইরে কোন কিছু করবার ক্ষমতা আর তাদের রইল না। চীন, আমেরিকা, ব্রিটিশ, ওলন্দাজ, রুস আর ফরাসী—এ ছাড়া অন্য সমস্ত বিদেশীর পক্ষেই জাপান তখন পর্যন্ত অবরুদ্ধ রয়ে গেল।

এই ঘটনার দশ বছর পর পর্যন্ত জাপানের আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যবস্থায় একটা বিরাট আলোড়ন চলল। জাপানের আভ্যন্তরীণ জীবনেও নবযুগ দেখা দিল।

## নবযুগ

দীর্ঘ অমা রজনীর পর জাপানের জাতীয় জীবনে নবারুণের দীপ্তি দেখা দিল। বিদেশীয় সম্পর্কের তিক্ততায় বিরক্ত হয়ে জাপান বহির্জগতের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়ে কূপমণ্ডুক হয়ে বসেছিল। কিন্তু সুদীর্ঘ কাল পর যখন আবার পাশ্চাত্যের সুসভ্য জাতি জোর করেই তাদের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করল, তখন আর জাপান চোখ বন্ধ করে থাকতে পারল না। ইতিপূর্বেই ওলন্দাজদের সম্পর্কে আসবার পর

থেকে জাপানী যুবসম্প্রদায়ের মনে আলোর ঝিকিমিকি দেখা দিয়েছিল, এখন তা' ছড়িয়ে পড়ল সর্বসাধারণের মধ্যেও।

এদিকে শোগানরাও ক্রমশঃই দুর্বল হয়ে পড়ছিলেন। শেষ পর্যন্ত চোচ্যু-র অভিযানে সরকার যখন ব্যর্থ হলেন তখন—১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রিন্স কেইজি সম্রাটের হাতে পদত্যাগ পত্র অর্পণ করলেন। কেইজি গোড়া থেকেই শোগান-রীতির উপর বিরক্ত ছিলেন—কাজেই এবার ক্ষমতা হস্তান্তর করে যেন দায়মুক্ত হলেন। সম্রাট্ মুৎসিহিতো সেই পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করে সাম্রাজ্যের শাসন-ভার নিজহস্তে গ্রহণ করলেন। এই সময় থেকেই সুরু হল নবযুগের—জাপানী ভাষায় 'মেইজি' পুনঃ প্রতিষ্ঠা।

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রাচীন আমলাতন্ত্রিক উপায়ে সরকারকে পুনর্গঠিত করা হল। যদিও নতুন শাসনতন্ত্রের রচনার পশ্চাতে সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব বর্তমান ছিল, তবু পাশ্চাত্যের প্রভাব খুব বেশি থাকায় তা' স্বেচ্ছাচারিতায় পরিণত হবার সুযোগ পায়নি। তাই এর পরবর্তী বছরেই ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে জাপানে প্রথম বারের মত পার্লামেণ্ট সৃষ্টি করা হল—এবং সব চেয়ে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হল সামন্ততান্ত্রিক প্রথার উচ্ছেদ। এতকাল পর্যন্ত জাপানের কয়েকটি বিশিষ্ট অভিজাত পরিবারই ছিলেন সাধারণ জাপানীদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। কিন্তু ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট্ এক নির্দেশনামার বলে এই সমস্ত

ক্ষুদে প্রভুদের প্রভূত ক্ষমতা বাতিল করে দিলেন। প্রাদেশিক শাসনকর্তার পদে অভিজাত পরিবারগুলির ছিল একচেটে অধিকার—তাদের সে অধিকার লুপ্ত হল।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনশীল প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্তৃত্বও সম্রাটের হাতে চলে এল। রাজকর্মচারীদের নিয়োগ ক্ষমতাও আবার সম্রাট্ ফিরে পেলেন। একমাত্র সামুরাই-রা পূর্বে যে সমস্ত জমি ভোগদখল করত, সে অধিকার তাদের পূর্ববৎ-ই রয়ে গেল। অবশ্যি সামুরাইদের এই বিশেষ সুবিধার বিরুদ্ধে অন্যান্য শ্রেণীর লোকেরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে লাগল। কিন্তু যা' হোক তেমন কোন ব্যাপক অশান্তির সৃষ্টি হল না তাতে। বিপদ দেখা দিল অন্য দিক থেকে।

অভিজাত ব্যক্তিদের রাজকর্মচারীর পদ থেকে অপসৃত করে যখন সাধারণ লোককে এই সমস্ত পদে নিযুক্ত করা হল, তখন শাসনকার্যে দেখা দিল ভয়ানক বিশৃঙ্খলা। পূর্ব অভিজ্ঞতা এবং বিশেষ শিক্ষা না থাকায় এই সমস্ত আধিকারিকদের মহা অসুবিধার সৃষ্টি হল। একেই তো সমগ্র শাসনব্যবস্থাকে নতুন করে ঢেলে সাজাতে হবে; তার উপর পাশ্চাত্যের আলোক এসে পড়ায় জনসাধারণও অধিকতর সুযোগ-সুবিধার আশা করে বসে আছে। এর উপর আবার দলীয় আর উপদলীয় নেতাদের মধ্যে মতবিরোধ। শোগান-তন্ত্রের বিরুদ্ধে তারা কাঁধে কাঁধ দিয়ে লড়েছে, কিন্তু

নবসৌধের ভিত্তি প্রতিষ্ঠায় তারা কাঁধে কাঁধ মিলাতে পারলে না।

সম্রাট্ নতুন শাসনতন্ত্র মঞ্জুর করে যে ঘোষণাপত্র শীঘ্রই প্রচার করবেন, তার বিষয়বস্তু সম্পর্কে মতভেদ প্রবল হয়ে উঠল। কেউ কেউ চাইলেন, সম্পূর্ণ পাশ্চাত্যের ধরনে সংবিধান রচিত হোক্, আর অধিকাংশই চাইলেন যে শাসন ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ দ্বারা সমস্ত শ্রেণীর হাতেই কিছু কিছু ক্ষমতা অর্পণ করা হোক। সংবিধান রচনা নিয়ে দুটো অধিবেশনও হয়ে গেল—কিন্তু ফল হল না কিছুই।

## কোরিয়া-সমস্যা

গোদের উপর বিষফোঁড়ার মত আবার চাপল কোরিয়া-সমস্যা। কোরিয়ার সঙ্গে জাপানের সম্পর্ক বহু প্রাচীন। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকে সম্রাজ্ঞী জিঙ্গোর রাজত্বকালে জাপ সৈন্য কোরিয়া অভিযান করলে কোরিয়ার রাজা বিনা যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করলেন। এর পর ১৫৯৭ খ্রীস্টাব্দে আবার জাপানীরা কোরিয়া আক্রমণ করে। এই যুদ্ধে জাপ সৈন্যদল কোরিয়ার দুই-তৃতীয়াংশ দখল করে নেয় এবং কোরিয়ার প্রধান কতগুলি নগরী বিধ্বস্ত করে। চীন কোরিয়াকে এ যুদ্ধে সাহায্য করেছিল, তা' সত্ত্বেও কোরিয়ার পতন হল। এরপর থেকে যখনই জাপানে কোন নতুন শোগান নিযুক্ত হতেন,

তখনই কোরিয়ার পক্ষ থেকে প্রচুর উপঢৌকনসহ রাজদূত প্রেরিত হত। কিন্তু শোগানতন্ত্রের পতন হবার পর থেকেই কোরিয়া পূর্বের বশ্যতা স্বীকারে অস্বীকৃত হল।

জাপান সম্রাটের মন্ত্রণাসভা কোরিয়া সম্পর্কে কোন অবিসংবাদিত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারলেন না। কেউ কেউ বললেন, কোরিয়ার এই মাথাচাড়া দেওয়া বরদাস্ত করলে নিজেদের অপরের চোখে হীন প্রতিপন্ন করা হবে। কেউ বা দেশের এই জরুরী অবস্থায় কোনপ্রকার সামরিক বলপ্রয়োগ করা নির্বুদ্ধিতার কাজ হবে বলে মন্তব্য করলেন। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, শান্তিবাদীর সংখ্যাই বেশি। যুদ্ধের সমর্থকগণ পদত্যাগ করলেন। তাদের কেউ কেউ বিদ্রোহের আওয়াজ তুললেন—সম্রাটের সৈন্যদল তাদের দাবিয়ে দিল। এই বিদ্রোহীর অন্যতম ছিলেন সাইগো। তিনি 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন' এই মূলমন্ত্র নিয়ে ফিরে এলেন নিজ প্রদেশ সৎসুমায়। সেখানে প্রচুর অর্থ ও প্রভাবের সাহায্যে সামুরাইদের স্বপক্ষে সংগঠিত করে তুলতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে জাপান-সরকার সৎসুমা-সামুরাইদের কিছুটা তুষ্ট করবার জন্যে জলপথে ফরমোসা আক্রমণ করে বসলেন। তাতে তাঁদের সামান্য লাভ হল বটে, কিন্তু চীনের সঙ্গে মনকষাকষি শুরু হল।

পরবর্তী বৎসর অর্থাৎ ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে কোরিয়ার সৈন্যগণ

জাপানের এক জাহাজের উপর অকারণ গোলাবর্ষণ করলে জাপান সরকার আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। সশস্ত্র-বাহিনী পাঠিয়ে তাঁরা কোরিয়ার সঙ্গে মৈত্রী ও বাণিজ্যচুক্তি দাবী করলেন। এই চুক্তির ফলে জাপান কোরিয়াকে নিজেদের তাঁবেদার রাজ্য মনে না করে সমান মর্যাদা দান করল। সৎসুমা-সামুরাই-রা এতে আরও চটে গেল। তারা ভাবল, এতে জাতির অপমান হয়েছে। এর উপর ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে জাপান সরকার যখন জনসাধারণের তরবারি ধারণ নিষেধ করে এবং অভিজাত ও সামুরাইদের কতকগুলি সুবিধা হরণ করে এক আদেশনামা জারী করলেন, তখন সৎসুমা-সামুরাইগণ সাইগোর নেতৃত্বে বিদ্রোহী হয়ে উঠল।

গত চার বছর ধরে তারা তৈরী হচ্ছিল—এবারে ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে সশস্ত্র বিদ্রোহ করল। সৎসুমা-সামুরাইদের সংখ্যা ছিল রাজকীয় বাহিনীর সমান—অধিকন্তু এরা ছিল পাশ্চাত্যের সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত এবং এদের হাতিয়ার ছিল রাইফেল ও কামান। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হবার অল্পকাল মধ্যেই সামুরাইদের ভাগ্যবিপর্যয় ঘটল—একে একে তাদের সব কয়জন নেতা আত্মহত্যা করলেন অথবা যুদ্ধে নিহত হলেন। উভয় পক্ষের সৈন্যদের মোট তিনভাগের এক ভাগ যুদ্ধে নিহত হল। জাপান দৈবক্রমে এক সামরিক শক্তির অধীন হতে হতে বেঁচে গেল।

সমরপ্রিয় জাপান আত্ম-রক্ষার ব্যূহও তৈরি করেছে দেশের স্থানে স্থানে। ওশাকার এই দুর্গ সেরকমই একটি দুর্গম স্থান।
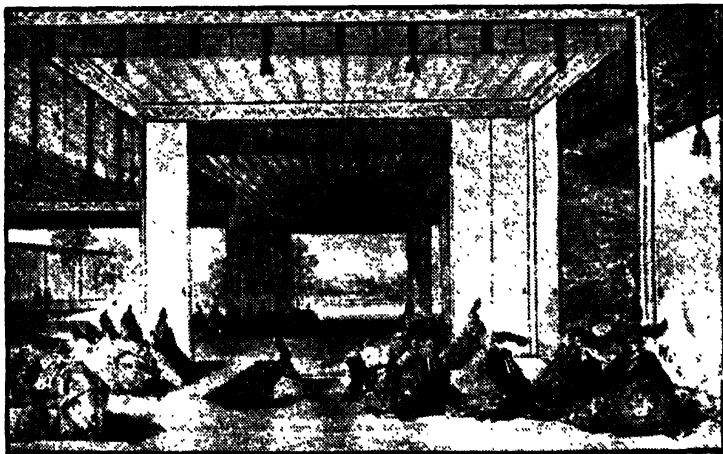
জাপানের দুর্ধর্ষ শাসনকর্তা শোগান—তাদেরও দরকার হ'ত মন্ত্রণার—তাই এই দরবার-গৃহ।

ফরমোসা, কোরিয়া ও সৎসুমা-সামুরাই সমস্যার হাত এড়িয়ে এক্ষণে জাপানীরা দেশের পুনর্গঠনে মনোনিবেশ করল। তারা সর্বপ্রকারে ক্রমশঃই পাশ্চাত্যের ধরন-ধারন গ্রহণ করছিল। তারা জাতীয় প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগে উচ্চ শিক্ষিত বিদেশীয়দের নিয়োগ করে দেশকে অগ্রগতির পথে চালনা করতে লাগল। রেল, টেলিগ্রাফ ও নৌবাহিনীর ভার দেওয়া হল ইংরেজদের উপর ; আইন-কানুন তৈরী ও সামরিক শিক্ষার ভার পড়ল ফরাসীদের উপর আর আমেরিকার উপর পড়ল দেশের শিক্ষা, ডাকবিভাগ ও কৃষিব্যবস্থার ভার। চিকিৎসা ও ব্যবসার ভার দেওয়া হল জার্মানদের উপর। স্থাপত্য ও শিল্পে নিয়োগ করা হল ইটালীয়ান স্থপতি ও শিল্পী। জাপান এইভাবে একদিকে বিদেশীয়দের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে—অপরদিকে জাতিগতভাবে অত্যন্ত রক্ষণশীল বলে নিজের গৃহে একেবারে ঘরোয়া চালচলনই চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে তাদের দ্বৈতজীবন সুরু হল। বাইরে পোশাকে-পরিচ্ছদে খাঁটি সাহেব, ভিতরে নিখুঁত জাপানী। এই দু'টি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাবধারার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা তাদের পক্ষে খুব সহজ ছিল না।

কোরিয়ার প্রসঙ্গ নিয়ে যাঁরা মন্ত্রণাসভা থেকে পদত্যাগ করেছিলেন, তাঁদের একজন হলেন কাউণ্ট ইতাগাকি। ইতাগাকি মন্ত্রণাসভার বাইরে এসেই জনমত-গঠনে নিযুক্ত হলেন। প্রথম প্রথম উত্তেজিত সামুরাইগণ ও তারপর

জনসাধারণও ইতাগাকির সমর্থক হয়ে দাঁড়াল। ইতাগাকি পার্লামেণ্টারী প্রথায় শাসনকার্য চালাবার জন্যে দেশময় আন্দোলন আরম্ভ করলেন। এইভাবে গণতন্ত্রের জন্যে চেষ্টিত হওয়ায় কাউণ্ট ইতাগাকিকে 'জাপানের রুসো' নামে অভিহিত করা হয়।

ইতাগাকি 'টোসা'কে কেন্দ্র করে তাঁর আন্দোলন চালান। সৎসুমা বিদ্রোহের সময় ইতাগাকি সম্রাটের নিকট এক স্মারকলিপি প্রেরণ করে গণতান্ত্রিক উপায়ে সংবিধান রচনার অনুরোধ জানালেন। কিন্তু জাপান সরকার বুঝলেন যে, জাপান এখনও গণতন্ত্র গ্রহণ করবার মত তৈরী হয়ে উঠতে পারেনি— তাই ইতাগাকির অনুরোধ উপেক্ষিত হল।

১৮৭৮ সালে জাপানের অন্যতম প্রধান মন্ত্রী ওকুবো টোসি-মিৎসু বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হবার দু'মাস পর এক রাজকীয় অনুশাসন প্রচারিত হল। তাতে দেশের কোন কোন অংশে নির্বাচনের সাহায্যে শাসন-সমিতি গড়ে তোলার নির্দেশ ছিল। এখানেই প্রথম গণতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপিত হল। এই স্থানীয় সমিতিগুলোই পরবর্তী কালের পার্লামেণ্টের প্রাথমিক শিক্ষায় সভ্যদের শিক্ষিত করল। কিন্তু কাউণ্ট ইতাগাকি ঠিক এ জিনিস চাননি। কাজেই তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে আবার আন্দোলন চালাতে লাগলেন এবং এই উদ্দেশ্যে 'জিযুতো' নামে এক দল গঠন করলেন। এইটেই জাপানের প্রথম রাজনৈতিক দল।

১৮৮১ সালে কাউণ্ট ওকুমা মতবিরোধের জন্যে মন্ত্রণাসভা থেকে বেরিয়ে এলেন। ১৮৮০ সালেই সম্রাট্ এক নতুন সংবিধান রচনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সেই প্রতিশ্রুতি পালিত হল আরও দশ বছর পর ১৮৯০ সালে। এই নতুন সংবিধান-অনুযায়ী স্থায়ী পার্লামেণ্ট বা 'ডায়েট্' স্থাপিত হল। এই উপলক্ষে দেশব্যাপী আনন্দের হুল্লোড় চলে এবং বিবিধ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সংবিধানের রচয়িতা হিসাবে মার্কুইস ইতো-র শাসন-সংস্কার বিখ্যাত হয়ে রইল। তিনি এই উদ্দেশ্যে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশ পর্যটন করে তাদের পার্লামেণ্টারীয় রীতিনীতি পর্যবেক্ষণ করে এসেছিলেন। সাধারণভাবে বলা চলে যে, পার্লামেণ্টের উপরই রাজ্যশাসনের সমস্ত ক্ষমতা অর্পিত হল। সম্রাটের হাতে বিশেষ কয়টি মাত্র অধিকার রয়ে গেল। ফলতঃ সম্রাট্ ইংলণ্ডের মতই নামে মাত্র সম্রাট্ রইলেন—আসলে গণতন্ত্রের অনুযায়ী দেশ শাসিত হতে লাগল। সুদীর্ঘকাল জনগণ স্বেচ্ছাচারিতার কবলে নিষ্পেষিত হয়ে আসছিল—এবার তারা শুধু মুক্তির আনন্দই লাভ করল না, পরন্তু দেশের শাসনক্ষমতাও হাতে পেল।

পার্লামেণ্টারী প্রথায় অনভ্যস্ত জাপান বিবিধ অসুবিধের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হতে লাগল—পার্লামেণ্টের মধ্যে বিভিন্ন দল-উপদল গড়ে উঠল; ক্রমশঃ একটি প্রবল সরকার-বিরোধী দলও দাঁড়িয়ে গেল।

কয়েক বছর আগে কোরিয়ার সঙ্গে জাপান যে সম্মান-জনক সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিল, জাপান এ পর্যন্ত তা' সৎভাবেই পালন করে আসছিল। এদিকে কোরিয়ার শাসন-ব্যবস্থায় চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। কোরিয়ার এই অবস্থায় জাপানের চিন্তিত হবার কারণ ছিল। কারণ জাপানের নিজের নিরাপত্তার প্রশ্নে কোরিয়া-সম্পর্ক অপ্রাসঙ্গিক নয়। এ দিকে কোরিয়ায় যে-কোন ঘটনা ঘটলেই চীন তাতে মাথা গলায়। এমনিতরো একটা অবস্থায় জাপান যখন কোরিয়ায় আইন-সংগতভাবে সৈন্য নামাল, তখন চীন দাবী ধরে বসল যে কোরিয়া তাদের অধীন দেশ—অতএব এখানে জাপানের কথা বলবার কোন অধিকার নেই।

জাপান এতকাল কোরিয়াকে স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা দিয়ে এসেছে। এক্ষণে চীনের এই অদ্ভুত এবং খামখেয়ালী দাবী মানতে সে অনিচ্ছুক হল। পক্ষান্তরে জাপান প্রস্তাব করল যে, চীন ও জাপান সম্মিলিতভাবে কোরিয়ার বিশৃঙ্খলা দূর করবে—কিন্তু চীন তাতে গররাজি। এমনি ধরনের কতকগুলো টুকটাক ঘটনার পর চীনই প্রথম আকস্মিকভাবে জাপানের সৈন্যবাহী জাহাজের উপর আঘাত হানল। পাল্টা আঘাতে জাপান চীনকে ঘায়েল করল। ১৮৯৪ সালে জুলাই মাসে উভয় পক্ষে যুদ্ধ বাধল। যুদ্ধে চীন ক্রমশঃই হটে যেতে লাগল। জাপান চীনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করল। অবশেষে ১৮৯৫ সালে ১৭ই

এপ্রিল শিমনোসেকিতে উভয় পক্ষে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হল।

এই সন্ধি অনুসারে অন্যান্য কতকগুলি সুবিধা-সহ জাপান মাঞ্চুরিয়ার কতক অংশের উপর অধিকার পেল। ফরমোসা এবং পেস্কোডোর চীনের হাতছাড়া হল; কোরিয়া স্বাধীন বলে স্বীকৃত হল। ক্ষতিপূরণস্বরূপ চীন প্রচুর টাকার জন্যে জাপানের নিকট ঋণী হল আর যে সমস্ত সর্তে চীন পাশ্চাত্যের কতকগুলো দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিল, জাপানও সেই সমস্ত সুযোগ লাভ করল।

কিন্তু জাপানের প্রতি দেবতা বিরূপ হলেন—তাই সন্ধি-পত্রের কালি শুকোতে না শুকোতেই জাপান-সম্রাট্ ফরাসী, রুস ও জার্মানীর কাছ থেকে এক সম্মিলিত পত্র পেলেন যে মাঞ্চুরিয়ার ওপর জাপান কোন স্থায়ী অধিকার পেতে পারে না।

এতে রুস ও ফ্রান্সের স্বার্থ ছিল, আর জার্মানী রাসিয়াকে খুশী করবার জন্যে তাদের সঙ্গে যোগ দিল। পত্রের ভাষা ভদ্র হলেও তার পশ্চাতে ছিল চোখ-রাঙানি। জাপ সরকার সদ্য সদ্য যুদ্ধে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন—কাজেই এই ত্রিশক্তির হুমকির বিরুদ্ধাচরণ করতে তাঁর সাহস হল না। কাজেই তাদের দাবী জাপান এ যাত্রা মেনে নিল। কিন্তু জাপানীরা পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে ভিতরে ভিতরে গজরাতে লাগল।

চীন-জাপান যুদ্ধের পর থেকেই জাপান ক্রমশঃ বহির্জগতে পরিচিতি লাভ করতে লাগল। জাপানের ভাগ্যও অত্যন্ত পরিবর্তনশীল হয়ে উঠল। কতকগুলো ঘটনা পরম্পরায় জাপান নিজেকেও বহির্বিশ্বের সঙ্গে ক্রমশঃই জড়িয়ে ফেলতে লাগল আর সঙ্গে সঙ্গে তার জাতীয় জীবনেও দেখা দিতে লাগল এর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। ইতিমধ্যে রাসিয়ানরা চীনের অন্তর্গত পোর্ট আর্থার অধিকার করেছে—চীনের অন্তর্গত শাণ্টুং-এর দক্ষিণাংশে জার্মানরা উপনিবেশ স্থাপন করেছে। ১৯০০ সালে চীনের বিখ্যাত বক্সার যুদ্ধে জাপান সৈন্যদলও বিদেশীদের পক্ষে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছে। ১৯০২ সালে গ্রেট্ ব্রিটেনের সঙ্গে জাপান সমসূত্রে মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ হল। এই চুক্তির ফলে পাশ্চাত্যেও জাপানের শক্তি স্বীকৃত হল।

## রুস-জাপান যুদ্ধ

এদিকে রুস সৈন্য মাঞ্চুরিয়ার মধ্যে দিয়ে রেল বরাবর ক্রমশঃ পূর্ব-দক্ষিণে এগিয়ে আসছিল। এর প্রতিবাদ জ্ঞাপন করলে রাসিয়ার জার সৈন্য-অপসারণে টালবাহানা করতে লাগলেন। রুস সৈন্যদল যদি চীনের এই অংশ অধিকার করে বসে, তবে প্রাচ্যের পক্ষে সমূহ বিপদ! জাপান আরও ভাবল যে, কোরিয়ার এত সন্নিকটে রুস সৈন্যের অবস্থান তার

স্বাধীন অস্তিত্বের পক্ষেও বিঘ্নকর হয়ে উঠবে। তাই মাসের পর মাস ধরে জাপ সরকার রুস সরকারের সঙ্গে কথাবার্তা চালানোর পরও যখন দেখা গেল যে, রুস সরকারের মতি-গতি সুবিধের নয়, তখনই ১৯০৪ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে জাপান রাসিয়ার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছেদন করে পোর্ট আর্থারের কাছে এক রুস জাহাজের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালাল এবং তাতে সে সাফল্য লাভ করল। এই ঘটনার ছয় দিন পর উভয়পক্ষই যুদ্ধঘোষণা করে। এদিকে রুস সৈন্যদল মাঞ্চুরিয়ার মধ্যে দিয়ে এগুতে এগুতে জাপানীরা কোরিয়া দখল করে নিল।

জাপানীরা নৌযুদ্ধে তো পটু ছিল, রাসিয়ার সঙ্গে স্থলযুদ্ধেও এবার তারা অসাধারণ পটুত্ব দেখাল। জাপ সৈন্যদল বীর-বিক্রমে রুস সৈন্যদের হটিয়ে দিয়ে চার দিক থেকে পোর্ট আর্থারকে বেষ্টন করে রাখল। এই অবস্থায় আট মাস কাটাবার পর ১৯০৫ সালে ২রা জানুয়ারী পোর্ট আর্থার আত্মসমর্পণ করল। তারপর জাপ সৈন্যদল মুকডেন পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে রুস সৈন্যদের তাড়িয়ে দিল। ঐ বৎসরই যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির মধ্যস্থতায় পোর্টসমাউথে রুস-জাপান সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হল। সন্ধির সর্ত অনুসারে রুস-অধিকৃত মাঞ্চুরিয়া চীনকে ফিরিয়ে দেওয়া হল; পোর্ট আর্থার সমেত লিয়া-টুং প্রদেশ জাপানের হস্তগত হল। কোরিয়া স্বাধীন বলে ঘোষিত হল—তবে জাপান তার

অভিভাবকরূপে তাকে দেখা শোনা করবে। সাখালিনের দক্ষিণাংশ, যা' ১৮৭৫ সালে জাপান রাসিয়াকে ছেড়ে দিয়েছিল, তা' আবার জাপানের দখলে এল।

রুস-জাপান যুদ্ধের পর সমগ্র বিশ্বেই জাপান সম্বন্ধে একটা সশ্রদ্ধ আচরণ দেখা গেল। পাশ্চাত্য শক্তিগুলি এতদিন পর্যন্ত প্রাচ্যকে উপেক্ষাই করে এসেছে—এবার দুর্দান্তপরাক্রম রাসিয়ার জারও যখন জাপানের নিকট পরাজিত হলেন, তখন অনেকের জ্ঞান-নেত্র খুলে গেল। জাপান ইতিপূর্বেই চীনকে যুদ্ধে হারিয়েছিল—এবার রাসিয়াকে হারানোর ফলে তার প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা যে অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে, এ তো স্বাভাবিক। ক্ষুদ্র একটা দ্বীপপুঞ্জের মুষ্টিমেয় অধিবাসী পৃথিবীর দুইটি বৃহত্তম দেশকে এমনভাবে হারিয়ে দিয়ে নিজেরাও পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিরূপে পরিগণিত হল।

১৯১২ সালে সম্রাট্ মুৎসুহিতোর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে জাপানের মেইজি পুনর্জাগরণ যুগেরও অবসান হল। নানা কারণে এই চুয়াল্লিশ বৎসরের মেইজি যুগ জাপানের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। প্রকৃতপক্ষে এই সময়টুকুর মধ্যেই জগতের অবজ্ঞাত অপখ্যাত কূপমণ্ডুক জাপান শুধু যে নিজেই দাঁড়িয়ে গেছে, তাই নয়, বহির্জগতেও সে যথেষ্ট ত্রাসের সঞ্চার করেছে। দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে যে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন এসেছে—তা'ও বিশেষভাবে

জাপান—

ভারতের ক্ষত্রিয়রা একদিন দিক্‌-বিদিক্‌ চমকিত করেছিলেন তাঁদের ক্ষাত্র তেজে। প্রাচীন জাপানে 'সামুরাই'রাও একদিন অধিকার করেছিলেন সেই স্থান। দেশে রাজা ছিলেন বটে—কিন্তু সামুরাইদেরই শাণিত তরবারি আনত দেশে শান্তি, বহিঃশত্রুকে করত পরাস্ত।

লক্ষণীয়। পাশ্চাত্য-বিদ্বেষী জাপান এই স্বল্পকালের মধ্যেই পাশ্চাত্যের অনুকরণে নিজেকে গড়ে তুলেছে। শিক্ষায়-দীক্ষায়, শিল্পে-বাণিজ্যে সর্বপ্রকারে সে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতিগুলোর সমকক্ষত্ব দাবী করবার অধিকার পেয়েছে এই মেইজি যুগেই। কাজেই মেইজি যুগকে জাপানের জাতীয় ইতিহাসের স্বর্ণযুগ আখ্যা দিলেও অত্যুক্তি হবে না।

সম্রাট্ মুৎসুহিতোর মৃত্যুর পর তার জ্যেষ্ঠপুত্র যোশিহিতো সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর স্বনামধন্য পিতা সিংহাসন আরোহণ কালে দেশ যে একটা সাংঘাতিক বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে চলছিল, বর্তমান সম্রাটের রাজ্যপ্রাপ্তিকালে দেশের অবস্থা তেমন না হলেও একেবারে সমস্যাহীনও ছিল না। শাসন-ব্যবস্থা, আর্থিক অবস্থা, চীনের সমস্যা—সব কিছু জাপানকে বিব্রত করে রেখেছিল। এর মধ্যে দেখা দিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ।

## প্রথম বিশ্বযুদ্ধ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জাপান ছিল মিত্রপক্ষে। ইতিপূর্বে ইংরেজদের সঙ্গে জাপানের পরপর কয়েকটা মৈত্রীচুক্তিও সম্পন্ন হয়েছিল। এই কারণে, জাপান তার মিত্রশক্তি ইংরেজদের স্বপক্ষে যোগদানই সমর্থনযোগ্য মনে করে। এই যুদ্ধে বিপক্ষ শক্তিদের মধ্যে প্রধান হল জার্মানী। যুদ্ধের প্রথম দিকেই

## জাপান

জাপান জার্মানীর নিকট দাবী জানাল যে, চীনের কীআউচৌ নামে যে অংশ তার অধিকারভুক্ত রয়েছে, তা' ছেড়ে দিতে হবে। এক বৎসরের মধ্যেই কীআউচৌ থেকে জার্মানদের তাড়িয়ে দিয়ে জাপান আরও শক্তিশালী হয়ে উঠল। চীনের কাছে কিন্তু ব্যাপারটা খুব ভাল লাগল না।

পরবর্ত্তী বৎসরই জাপান চাপ দিয়ে চীনকে একুশটি সর্তযুক্ত এক সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করল। এর ফলে দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া এবং মঙ্গোলিয়ার কতক অংশে জাপান কতকগুলো বিশেষ সুবিধে পেল। কিন্তু তা' সত্ত্বেও জাপানের সামনে কতকগুলো নতুন সমস্যা দেখা দেওয়ার ফলে জাপান আরও বিব্রত হয়ে পড়ল। কোরিয়া স্বাধীনতার জন্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। ঘরেও তার স্বস্তি নেই—প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে দেশময় আন্দোলন চলছে। এদিকে যুদ্ধও শেষ হয়ে গেছে। নতুন জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা হবার ফলে আন্তর্জাতিক সম্পর্কে নানা পরিবর্ত্তন দেখা দিল। জাপানকে শাণ্টুং থেকে সৈন্যদল ফিরিয়ে আনতে হল—তার স্থল ও নৌবাহিনীর সংখ্যা কমাতে হল। এ হল ১৯২২ সালের কথা।

কিন্তু ছ'সাত বছর পরেই জাপান আবার চীনের শাণ্টুং প্রদেশে সৈন্য মোতায়েন করল। তারপর থেকেই সুরু হল আবার দীর্ঘ কালব্যাপী চীন-জাপান যুদ্ধ।

## জাপান

চীনের উত্তর-পূর্বাংশে অবস্থিত মাঞ্চুরিয়া বরাবরই জাপানের নিকট ভয় ও লোভের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ভয় এই জন্যে—এর সংলগ্ন সোভিয়েট রাষ্ট্র জাপানের চিরশত্রু, মাঞ্চুরিয়ার উপর সোভিয়েটেরও লোভ ছিল। যদি তারা এটা দখল করে নিতে পারে, তবে জাপানের অস্তিত্বই বিপন্ন হবে। অধিকন্তু জাপানের অধীন কোরিয়াও মাঞ্চুরিয়ার সংলগ্ন—কাজেই মাঞ্চুরিয়ায় অন্যের অধিকার থাকলে কোরিয়ায়ও জাপানের সমূহ বিপদ দেখা দিতে পারে।

আর লোভ এই যে—মাঞ্চুরিয়া চীনের একটা প্রধান সমৃদ্ধিশালী অঞ্চল। এর ভূমি অত্যন্ত উর্বর এবং ভূমির অভ্যন্তরে আছে প্রচুর কয়লা, লৌহ, স্বর্ণ ও তৈলের খনি। অতএব যদি মাঞ্চুরিয়া হস্তগত করা যায়, তবে জাপানের সাম্রাজ্যলিপ্সাও যেমন পূর্ণ হয়, তেমনি অতর্কিত শত্রুর আক্রমণ-ভয়ও অনেকটা নষ্ট হয়। এই উদ্দেশ্যে ১৯৩১ সালে জাপান মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করে বসল এবং অতি শীঘ্রই পরাজিত ও পলায়িত চীনাবাহিনীকে অনুসরণ করে চীন প্রাচীরের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ল। তারপর সাংহাইকে কেন্দ্র করে সুরু হল উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম।

চার মাস যুদ্ধ চালানোর পর জাপানীরা এখান থেকে সরে গেল। কিন্তু তা' হলেও চীন-জাপানের এই সম্পর্ক চীনের পক্ষে বিশেষ শুভ নয় দেখে চীন জাতিসংঘের দরবারে নালিশ

জানাল। জাতিসংঘের গঠিত কমিসন জাপানের বিরুদ্ধে রায় দিলে জাপান জাতিসংঘ থেকে পদত্যাগ করল—কিন্তু চীন সম্বন্ধে তার নীতির কোনই পরিবর্তন হল না।

১৯৩১ সালে জাপানের পৃষ্ঠপোষকতায় ও নির্দেশে মাঞ্চুরিয়ায় 'মাঞ্চুকোও' নামে এক রাজ্য স্থাপিত হল এবং তথায় চীনের ভূতপূর্ব সম্রাট্ পুইকে তার শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হল। মাঞ্চুকোও হল জাপানের এক তাঁবেদার রাজ্য আর একমাত্র জাপানই তাকে স্বাধীন রাজ্য বলে মেনে নিল।

চীন-জাপান যুদ্ধ কিন্তু এতেই শেষ হল না। জাপান সৈন্যবাহিনী নিয়ে ক্রমশঃ এগিয়ে যেতে লাগল। উত্তর চীনের অনেকগুলো নগর-নগরীই জাপানের অধিকৃত হল। এমন কি পিকিংও জাপানের দখলে এসে গেল। ১৯৩৭ সালের চিয়াং কাইসেকের নেতৃত্বে চীনারা নতুন শক্তি ও উদ্দীপনা নিয়ে যুদ্ধে নামল। প্রথম প্রথম তারা জাপ সৈন্যবাহিনীকে কিছুটা দমিয়ে দিলেও পাশ্চাত্য ধরনে শিক্ষিত ও আধুনিক যুদ্ধের উপকরণ-সমন্বিত জাপ বাহিনী অতি শীঘ্রই চীনা সৈন্যদের পরাজিত করে আবার এগিয়ে যেতে লাগল। তারা সমভূমিতে রেল লাইন ধরে গ্রামের পর গ্রাম, নগরের পর নগর অধিকার করে যেতে লাগল। উত্তর চীন তো পূর্বেই জাপানের কুক্ষিগত হয়েছিল, এবার পূর্ব চীনেরও অধিকাংশ তার হাতে এসে গেল। ১৯৩৯ সালে জাপানের

গতি হল দুর্দম—নানকিং অধিকার করে তারা চলল হ্যাঙ্কাও-এর দিকে। দক্ষিণে যেতে যেতে তারা ক্যান্টন পর্যন্ত অধিকার করে নিল।

এদিকে জাপানের নিজেদের মধ্যে নানাপ্রকার বিরোধ দেখা দিতে লাগল। ১৯৩৬ সালে জাপানের কয়েক-জন চরমপন্থী সামরিক নেতা সম্রাটের ক্ষমতা হস্তগত করার উদ্দেশ্যে অকস্মাৎ বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। এরই ফলে জাপ সরকারের তিনজন মন্ত্রী নিহত হলেন। বিদ্রোহ শীঘ্রই দমিত হল—কিন্তু এর ফলে সম্রাটের ক্ষমতা আরও বেড়ে গেল। পার্লামেণ্টারী ক্ষমতা ক্রমেই অন্তর্হিত হতে লাগল। জাপানের জঙ্গীনীতি ও সাম্রাজ্যবাদের সমর্থনে জাপ নেতারা জনসাধারণের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়ে দিতে লাগলেন যে, জাপান সম্রাট্ স্বয়ং ঈশ্বরের প্রতিনিধি আর জাপানের জন-সাধারণও দেববংশজাত। এইভাবে স্বজাতির প্রতি এক অন্ধ-গৌরবের ভাব সৃষ্টি করে নেতারা জাপানকে রণোন্মাদনায় মাতিয়ে তুললেন।

## দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

১৯৩৯ সালে—য়ুরোপে রণদামামা বেজে উঠেছে; তার ঢেউ সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে এসে পৌঁছল দূরতম প্রাচ্যের কূলে উপকূলে।

## জাপান

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম দিকে জাপান চুপ করে রণরঙ্গ-মঞ্চের গতিবিধি সাগ্রহে পর্যবেক্ষণ করছিল। ইংরেজ তখন যুদ্ধে ব্যস্ত ও দূর প্রাচ্যে তার শক্তি কম—জাপান প্রথমেই এই সুযোগের পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করল। ইতিপূর্বে ব্রিটেন ও আমেরিকা থেকে অনেক সাহায্য চীনে এসে পৌঁছত ব্রহ্মদেশের মধ্যবর্ত্তী বর্মারোড নামে রাস্তা দিয়ে। জাপান ইংরেজকে জানাল যে, এ রাস্তা বন্ধ করে দিতে হবে। ইংরেজের পক্ষে বর্ত্তমান অবস্থায় জাপানের এ হুমকি না মেনে উপায় ছিল না। বাধ্য হয়ে ইংরেজ বর্মারোড বন্ধ করে দিল। ফ্রান্স-সরকারের পতনের পর ফরাসী-অধিকৃত ইন্দোচীনের ভিতর দিয়েও চীনে খাদ্য বা অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করবার দাবী জানালে ফরাসী সরকারও জাপানকে অসন্তুষ্ট করতে সাহস পেল না—ফলে ঐ পথও বন্ধ হল।

জাপানের তখন এক বিরাট মতলব ছিল। বৃহত্তর পূর্ব-এসিয়া গঠনের পরিকল্পনা নিয়ে জাপান এক নূতন ব্যবস্থার (New Order) কথা বহুল প্রচার করে আসছিল। তার ঝোঁক ছিল ইন্দোচীন, থাইল্যাণ্ড, ব্রহ্মদেশ ও পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জগুলির উপর। পাশ্চাত্যে যখন ফরাসী, ইংরেজ ও ওলন্দাজ সরকার রীতিমত ঘায়েল হয়ে পড়েছে, তখন জাপানের মনে হল এই যুদ্ধে মিত্রশক্তির পরাজয় এবং অক্ষশক্তির জয়লাভ সুনিশ্চিত। এদিকে তিন মাস কাল বর্মারোড বন্ধ রাখবার পর ইংরেজ

সরকার আবার পথ মুক্ত করে দিলেন। এতে জাপান ভয়ানক রুষ্ট হল।

তারপরই ১৯৪০ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর জাপান জার্মানী ও ইতালীর সঙ্গে এক সামরিক ও বাণিজ্যিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। কিন্তু তখন পর্যন্ত মিত্রশক্তির সঙ্গে তার বিরোধিতা আরম্ভ হয়নি। জাপান তখন একদিকে চীনযুদ্ধে ক্রমাগত এগিয়ে যাচ্ছে আর ঘরে বসে ভবিষ্যতের জন্যে অস্ত্র শানাচ্ছে। ঐ বছরই নবেম্বর মাসে সংবাদ রটল যে জাপ নৌবাহিনী ইন্দোচীনের ধারে কাছে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে। ঐ মাসে এক আমেরিকান চিঠির উত্তরে জাপান থেকে বলা হল যে চীন, জাপান ও মাঞ্চুকোও চিরকাল বন্ধুর মত থাকবে এবং পূর্ব এসিয়ায় নতুন আদর্শ স্থাপনের জন্যে চেষ্টা করবে। জাপানী-দের মতে পাশ্চাত্যের শক্তিগুলো এবং আমেরিকাই এত দিন ধরে সমগ্র প্রাচ্যকে শোষণ করে আসছে।

১৯৪১ সালে ৬ই ডিসেম্বর আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জাপ সম্রাট্ হিরোহিতোর নিকট শান্তির জন্যে এক দূত পাঠালেন। ৭ই ডিসেম্বর জাপান আচমকা পার্ল হারবারে মার্কিন নৌবাহিনীর উপর আক্রমণ চালাল। ঐদিনই ম্যালিনাস্থিত মার্কিন ঘাঁটি এবং সিঙ্গাপুরের উপরও বোমা বর্ষণ করা হল, আর জাপ সৈন্যদল মালয় এবং থাইল্যাণ্ডে (শ্যামদেশে) অবতরণ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এক নতুন চমক লাগাল।

পরদিন আমেরিকা এবং ব্রিটেনও জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। এতদিন পর্যন্ত আমেরিকা সক্রিয়ভাবে যুদ্ধে কোন অংশ গ্রহণ করে নি—এক্ষণে জাপানের আস্পর্ধা তাকেও বিচলিত করে তুলেছে। মার্কিন নৌ ও বিমানবাহিনী জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামল।

শুধু আমেরিকা ও ব্রিটেন নয়, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড্ ও দক্ষিণ আফ্রিকা অর্থাৎ মিত্রশক্তির সবাই একযোগে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামল। কিন্তু যুদ্ধের প্রথম দিকে জাপানের গলায়ই জয়লক্ষ্মী বরমাল্য অর্পণ করেছিলেন।

৮ই ডিসেম্বর থাইল্যাণ্ড আক্রমণ করে ১১ই ডিসেম্বর তার সঙ্গে জাপান মৈত্রীচুক্তি সম্পন্ন করল।

৯ই ডিসেম্বর জাপানী সৈন্যদের আচমকা আক্রমণ করবার উদ্দেশ্যে ব্রিটেন তার প্রসিদ্ধ নৌবাহিনী 'প্রিন্স অব্ ওয়েলস্' এবং 'রিপাল্‌স্'-কে শ্যাম-উপসাগরে পাঠিয়েছিল—কিন্তু দুর্ভাগ্য-ক্রমে জাপ সৈন্যদল এদের জলে ডুবিয়ে দিল।

হংকং চীনের একটি আন্তর্জাতিক বন্দর—গত কয়েক বৎসর ধরে এর রক্ষণাবেক্ষণের ভার আছে ইংরেজ-দের উপর। এক্ষণে জাপান হংকংকে আত্মসমর্পণের আদেশ দিল। কিন্তু সে আদেশ প্রতিপালিত না হওয়ায় জাপ-সৈন্য জলে, স্থলে ও ব্যোমপথে যুগপৎ আক্রমণ চালাল হংকং-এর উপর। ২৫শে ডিসেম্বর হংকং আত্মসমর্পণ করল,
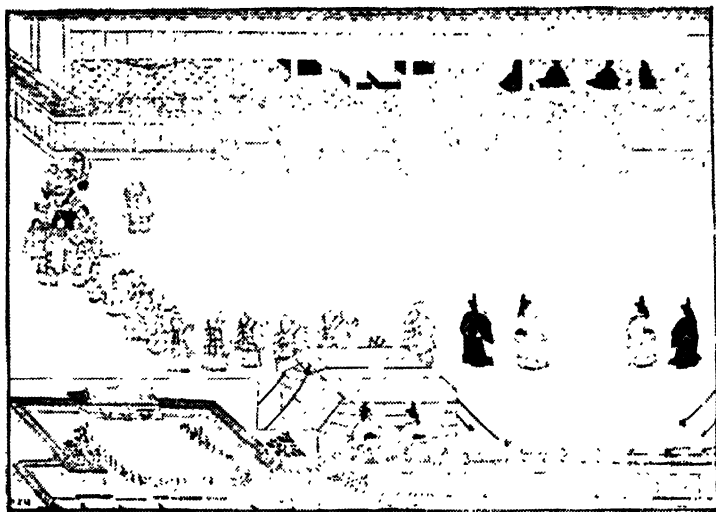
ধর্মবিশ্বাসেও জাপান অর্বাচীন নয়। অতি প্রাচীন কাল থেকেই জাপানীদের জীবন-পথে সিন্তোধর্ম বহু জটিল প্রশ্নের সমাধান হয়ে আসছে। আজও বৌদ্ধ-ধর্মের পাশাপাশি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে এই ধর্ম। 'পূর্ব-পুরুষদের পূজা' বলেও এ ধর্ম পরিচিত।
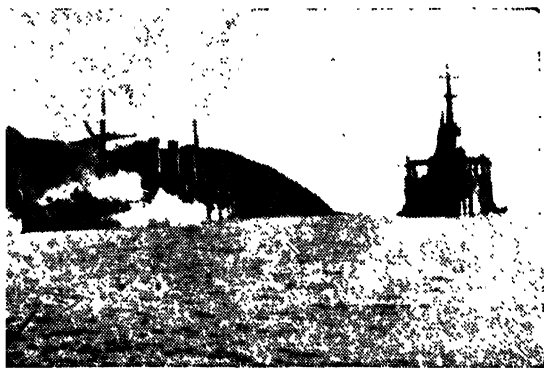
ইতিমধ্যে ফিলিপিন, মালয় এবং পূর্ব-ভারতের বিভিন্ন দ্বীপপুঞ্জে জাপ সৈন্য সমানে আক্রমণ চালিয়ে যেতে লাগল—মিত্র-বাহিনী সর্বত্রই পশ্চাৎপদ হতে লাগল। ১৯৪২ সালের ২রা জানুয়ারী ফিলিপিনের রাজধানী ম্যানিলা জাপ বাহিনী দ্বারা অধিকৃত হল। তারপর সুরু হল সিঙ্গাপুরের উপর আক্রমণ।

য়ুরোপখণ্ডে জার্মান বাহিনী যখন যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় বিদ্যুৎগতিতে গ্রামের পর গ্রাম, দেশের পর দেশ অধিকার করে যাচ্ছিল, দূরতম প্রাচ্যের যুদ্ধেও তাদের মিত্রপক্ষ জাপ বাহিনী অনুরূপভাবে সাফল্যলাভ করে চলল!

থাইল্যাণ্ড জাপানের সঙ্গে মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হয়ে—সেও ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। থাইল্যাণ্ডকে ঘাঁটিরূপে পাওয়ায় জাপানের পক্ষে পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও ব্রহ্মদেশে আক্রমণ চালান সহজতর হয়ে গেল। সিঙ্গাপুরের ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী ক্রমশঃ পশ্চাতে হটতে লাগল—১৫ই ফেব্রুয়ারী সিঙ্গাপুরের পতন হল। আর তার আগেই জাপ সৈন্যদল রেঙ্গুনে বোমা-বর্ষণ করতে আরম্ভ করেছিল। ১০ই ফেব্রুয়ারী তারা মার্তাবান অধিকার করল। ২৭শে ফেব্রুয়ারী জাভা উপসাগরের যুদ্ধে জাপ নৌবাহিনী কর্তৃক মিত্রশক্তির বহু রণতরী বিধ্বস্ত হল। জাপ বাহিনী দুর্বার গতিতে অগ্রসর হতে লাগল দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ায়। ৪ঠা মার্চ তখনকার ব্রহ্মের গবর্ণর পালিয়ে চলে এলেন ভারতে, ৭ই মার্চ ইংরেজ সৈন্যরাও রেঙ্গুন

পরিত্যাগ করল। ১২ই মার্চ আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ থেকে ইংরেজ সৈন্য অপসৃত হল।

এই প্রসঙ্গে আমাদের প্রিয় নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নাম উল্লেখযোগ্য। ভারতবর্ষকে ইংরেজের অধীনতাপাশ থেকে মুক্ত করবার আগ্রহে কয়েকজন স্বদেশপ্রিয় ভারতবাসী অনেক পূর্বেই ভারত ত্যাগ করেছিলেন। এক্ষণে সুযোগ বুঝে জাপ সরকারের সহায়তায় তাঁরা আজাদ হিন্দ্ বাহিনী গঠন করে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। মাতৃভূমি থেকে পালিয়ে নানাদেশ ঘুরে ফিরে অবশেষে সুভাষচন্দ্র এসে এঁদের সঙ্গে যোগদান করলেন এবং আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর 'নেতাজী' নির্বাচিত হলেন। এই আজাদ হিন্দ্ বাহিনীই আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করে তথায় জাতীয় সরকার স্থাপন করলেন এবং তাদের নাম দিলেন যথাক্রমে 'স্বরাজ' ও 'শহীদ' দ্বীপপুঞ্জ।

এদিকে জাপ সৈন্যবাহিনী অগ্রবর্তী হয়ে ব্রহ্মের অনেকটা অংশ অধিকার করল। ব্রহ্ম থেকে সামরিক ও অসামরিক ব্যক্তিদের পালানোর হিড়িক পড়ে গেল। আজাদ হিন্দ্ বাহিনী মণিপুরের অভ্যন্তরে এসে উপস্থিত হল। মার্কিন সৈন্য-বাহিনী মূল জাপ ভূখণ্ডে বোমাবর্ষণ করতে আরম্ভ করল। টোকিও, ওসাকা, কোবে ও ইয়াকোহামা মার্কিন বোমার আঘাতে কিছু কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হল। আসামে ও চট্টগ্রামে

জাপান

জাপ বাহিনী বোমাবর্ষণ করল। সলোমন দ্বীপপুঞ্জে, কোরাল উপসাগরে ও গুয়াদালক্যানালে জাপান ও মার্কিন বাহিনী পরস্পরের সম্মুখীন হল। জাপান কয়েকবার পরাজয়-বরণ করল।

## চরম পরাজয়

ভাগ্যলক্ষ্মী এতদিন দু'হাত উজাড় করে জাপানকে বরদান করেছেন, এবার বুঝি বিরূপ হলেন। তাই জাপ বাহিনীর আরাকান আক্রমণ ব্যর্থ হল। চীন-জাপান যুদ্ধেও জাপান বিপর্যয়ের সম্মুখীন হল। ১৯৪৩ সালের গোড়াতেও জাপান পর পর ব্যর্থ হতে লাগল। অক্টোবরে রবাউল বন্দরে জাপানীদের প্রভূত ক্ষতি হল। কিন্তু জাপান দমল না— ১৯৪৪ সালের প্রথম দিকে জাপান আবার নতুন উদ্যমে আরাকান আক্রমণ করল।

১৯৪৫ সালে য়ুরোপে যুদ্ধের গতি একটা চরম অবস্থায় উপনীত হবার ফলে এদিকে মিত্রশক্তি বেশি নজর দিতে পারে নি। কিন্তু মার্কিন সেনাপতি ম্যাক-আর্থার ক্রমশঃই জাপ শক্তিকে খর্ব করে আনছিলেন। চীনেও জাপানীরা একটু একটু করে পশ্চাৎপদ হচ্ছিল। মার্কিন সমর-শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে এসে চীনা সৈন্যবাহিনীও ক্রমশঃ যোগ্যতর হয়ে

উঠছিল। তারা ১৯শে জুলাই জাপ সৈন্যদের কোরেলিন থেকে বিতাড়িত করল।

জাপান ইংরেজ ও মার্কিনদের সঙ্গে যুদ্ধরত হলেও এতকাল পর্যন্ত রাসিয়াকে চটাতে সাহস করে নি। কিন্তু এবার রাসিয়া নিজেই জাপানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করল। সোভিয়েট বাহিনী দ্রুত এসে উপস্থিত হল মাঞ্চুরিয়ায়—মাঞ্চুরিয়া এতকাল ছিল জাপানের তাঁবেদার রাজ্য। সোভিয়েট বাহিনী মাঞ্চুকুওর বালক-সম্রাটকে বন্দী করল। এতে জাপানীরা অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়ল। ৮ই মে য়ুরোপের যুদ্ধ শেষ হল—জার্মান বাহিনী পরাজিত হয়ে মিত্রশক্তির হাতে আত্মসমর্পণ করল।

প্রাচ্যের যুদ্ধ এখনও শেষ হয়নি—তার সমাপ্তি ত্বরান্বিত করে তুলবার জন্যে মার্কিন বাহিনী জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকির উপর আণবিক বোমা নিক্ষেপ করল। আণবিক বোমার বিরুদ্ধে লড়বার আর কোন উপায় নেই—২রা সেপ্টেম্বর মিসৌরী জাহাজে জাপান বিনা সর্তে আত্মসমর্পণ করল। তারপর ৯ই সেপ্টেম্বর দশ লক্ষ জাপ সৈন্য চীনা সেনাপতি হো-ইং-চীনের নিকট বিনা সর্তে আত্মসমর্পণ করল। দীর্ঘকালের যুদ্ধ এইভাবে শেষ হল।

জাপান তার জাতীয় জীবনে এই প্রথমবার বিদেশীর পদানত হল। জগতের অপর কোনও জাতি এত সুদীর্ঘকাল স্বীয় স্বাধীনতা বজায় রাখতে পেরেছে কিনা সন্দেহ।

## জাপান

যুদ্ধে পরাজয়ের পর মার্কিন সেনাপতি জেনারেল ম্যাক-আর্থারকে জাপানের সামরিক শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হল। অবশ্য জাপানের প্রতি অপেক্ষাকৃত সদয় ব্যবহার করে তথাকার সম্রাট্ হিরোহিতোর প্রতি কোনপ্রকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। তিনি পূর্ববৎ জাপানের সম্রাট্ রয়ে গেলেন। তবে এতকাল পর্যন্ত জাপানের সম্রাট্‌গণ নিজেদের 'দেবতা' বলে যে দাবী জানাতেন, সম্রাট্ হিরোহিতো প্রকাশ্য দরবারে তাতে অস্বীকৃতি জানালেন। জাপানের ইতিহাসে সম্রাটের এরূপ আত্মস্বীকৃতিও অভিনব।

যুদ্ধের অপরাধে জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজো এবং তাঁর সহকর্মীদের প্রাণদণ্ড বিধান করা হল।

# জীবন যাত্রা

একটা জাতির সর্বাঙ্গীণ পরিচয় পেতে হলে আমাদের জ্ঞান শুধু মাত্র তার রাজা-রাজড়াদের কাহিনী বা তার যুদ্ধ-বিগ্রহের কাহিনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলেই চলবে না। কারণ জাতির প্রকৃত পরিচয় তার ধর্মে-কর্মে, শিক্ষায়-দীক্ষায়,

চলনে-বলনে, সভ্যতায়-সংস্কৃতিতে—এক কথায় তার দৈনন্দিন জীবন-যাত্রায়। জাপানীদের জীবনযাত্রার বিভিন্ন ধারাগুলোকে নিয়ে আলোচনা করলেই আমরা প্রকৃতপক্ষে খুঁজে পাব, কোথায় তাদের ব্যক্তিমানসের উৎস। তাদের সৌন্দর্যপ্রিয়তা ও রুচিবোধ, তাদের কর্মক্ষমতা ও শৌর্য—সব কিছুর মূলে আছে যা', তারই কথা এখানে বলছি।

জাপানের ঘর-বাড়ীগুলো বাইরে থেকে দেখলে খুব সুদৃশ্য বলে মনে হয় না। সাধারণতঃ কাঠের বেড়া, টালি অথবা খড়ের ছাউনি—এই তাদের ঘর; তবে সাধারণতঃ সব বাড়ী-ঘরই দেখতে প্রায় একরকম। হালে সেখানে ইট-পাথর দিয়েও কিছু কিছু বাড়ী তৈরী হচ্ছে।

শুনলে অবাক্ হবে যে টোকিও এবং কিওটো-তে যে দুটো রাজপ্রাসাদ আছে, তা'ও কাঠের তৈরী। জাপানের ভূমিকম্পের কথা তোমাদের আগেই তো বলেছি। সেই ভূমিকম্পের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে একরকম শক্ত কাগজের বাড়ীও নাকি সেখানে তৈরী হয়। তাদের দামও খুব বেশী নয়, আর, একবার নষ্ট হয়ে গেলে নতুন তৈরী করতেও খুব বেশি সময় লাগে না। এই কারণেই জাপানে সাধারণতঃ অতি হাল্কা ধরনের বাড়ী তৈরী হয়। বাড়ীর বাইরের দিক্‌টা সুদৃশ্য না হলেও ভিতরের দিক্‌টা সৌন্দর্যে অপূর্ব। সেখানে বিভিন্ন ধরনের কাঠ ও কাঠের

কারুকার্য দেখলে জাপানীদের সৌন্দর্যপ্রীতির শত মুখে প্রশংসা করতে হয়। ঘরের দরজায় কাগজের পাল্লা লাগানো হয় এবং বাইরে থেকে দরজাগুলোকে দেখা যায় না। মেজে ঢেকে দেওয়া হয় পুরু ঘাসের মাদুর দিয়ে—মাদুরগুলোতে নানা রকম নক্সা আঁকা থাকে। এই মাদুরের উপরই তারা বসে, খায় এবং ঘুমোয়। শোবার সময় ছাড়া বিছানাগুলোকে অন্যত্র সরিয়ে রাখে। তারা সাধারণতঃ কাঠের বালিশ ব্যবহার করে।

শীতের সময় কোন কোন ঘরে সারাদিন ধরে কয়লা পুড়িয়ে ঘরকে গরম করে রাখা হয়।

জাপানীরা বাঙ্গালীর মতই মাছ-ভাত খায়। সাধারণ জাপানীদের খাদ্য ভাত—তবে অপেক্ষাকৃত গরীবদের খাদ্য যব, গম ইত্যাদি। মাছ ও নানাপ্রকার সামুদ্রিক আগাছা জাপানীদের অতি প্রিয় খাদ্য। আধুনিক কালে মাংস এবং দুগ্ধেরও যথেষ্ট চলন হয়েছে। তাদের সব চেয়ে প্রিয় পানীয় হল চা—তবে আমাদের মত দুধ-চিনি মিশানো নয়। চা পানের সময় তাদের সকাল-সন্ধ্যে নয়, যখন খুশী তখন। দেশীয় প্রথায় চাল থেকে তৈরী একপ্রকার মদেরও খুব চলন আছে। তবে এ ধরনের মদ তারা গরম করে খায়।

আধুনিক কালে বাড়ীর বাইরে অধিকাংশ জাপানীই য়ুরোপীয় পোশাক পরিধান করলেও তাদের জাতীয় পোশাকের

মূল্য ও মর্যাদা তাদের কাছে কম নয়। গ্রীষ্মকালে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে জাপানীরা আলখাল্লার মত বড় এবং ঢিলে-ঢালা এক-প্রকার পোশাক পরে—কিন্তু সেগুলোর বুক চেরা থাকে এবং ফতুয়ার মত তা' বাঁ দিকে বেঁধে রাখতে হয়। শীতের দিন এর উপর আর একটা জামা চড়ানো হয়। পুরুষরা একরকম পাৎলুন এবং মোজা পরে থাকে। জাপানীদের পোশাক কিমোনো সমগ্র জগতেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। য়ুরোপীয়-গণও বাড়ীতে অনেক সময় জাপানীদের অনুকরণে কিমোনো পরে থাকেন। জাপানীরা যে জুতো পরে থাকে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা' হয় কাঠের, নয়তো খড়ের তৈরী। জাপানীরা কখনও জুতো পায় দিয়ে ঘরে যায় না। জুতো দরজার বাইরে রেখে ঘরে গিয়ে বেশ পা মুড়ে মাদুরে বসে। ঘরের মধ্যে আসবাবপত্র বলতে প্রায় কিছুই থাকে না।

জাপানী মেয়েদের চুলের বাহার দেখবার মত। তাদের খোঁপার মত এত বৈচিত্র্য আর কোথাও দেখা যায় না। জাপানী মেয়েরা ভারী সুন্দর ছবি আঁকা ছাতা ব্যবহার করে। তবে জাপানী ছাতা এবং ওভারকোট অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাগজের তৈরী।

সৌন্দর্যপ্রীতির জন্যে জাপানীরা বিখ্যাত। সম্ভবতঃ তথাকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যই তাদের মনে এত প্রভাব বিস্তার করে সৌন্দর্য-সম্বন্ধে জাপানীদের এত সচেতন করে তুলেছে। জাপানে

সৌন্দর্যের ছড়াছড়ি। এত বাগান এত ফুলের গাছ সম্ভবতঃ আর কোথাও দেখা যায় না। ছুটির দিনগুলোতে জাপানীরা বেরিয়ে পড়ে সৌন্দর্যলোকের সন্ধানে। বেরী, প্লুম আর পীচ গাছ – মানুষের মনে আনন্দের বান ডাকিয়ে দেয়। পথের দু'ধারে সারি সারি গাছ—প্রতি বাড়ীতে বাগান, সেখানেও গাছের ছড়াছড়ি। জগতের অপর কোন জাতির লোকই এতটা পুষ্পবিলাসী নয়। আর সম্ভবতঃ তাই তাদের ছাতায়, জামায়, টুপী, ঘরে-দোরে সর্বত্রই রঙ্গীন ফুলের ছবি।

আর জাপানী বাড়ীগুলিও যেন এক একটা ছবির মত। ছোট একটা বাড়ী—বাড়ীর সংলগ্ন অপূর্ব সুন্দর এক একটা বাগান। অনেক বাড়ীতেই আছে পুকুর—সম্ভবপর হলে পুকুরের মধ্যে একটা দ্বীপ তৈরী করে কাঠের পুল দিয়ে তাকে বাড়ীর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। আমরা কাজের প্রয়োজনে জঙ্গলের মধ্যে বাঁশ-ঝাড় লাগাই; কিন্তু ওদেশে বাঁশগাছগুলোকে দেখলেও চোখ জুড়িয়ে যায়। যে কোন বিদেশীই জাপানের সৌন্দর্যের এবং জাপানীদের সৌন্দর্যপ্রীতির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে থাকেন।

জাপানীদের পুষ্প-প্রীতির আর একটি নিদর্শন পুষ্প-মেলা। প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় জাপানী শহরের কোন না কোন অংশে পুষ্প-মেলা অনুষ্ঠিত হয়। আর প্রতি সন্ধ্যায় জাপানী যুবক-যুবতীর পুষ্প-মেলায় গমন একটা নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার।

## জাপান

আধুনিক যুগে পাশ্চাত্যের প্রভাবে জাপানীদের জীবন-যাত্রায় অনেকটা পরিবর্তন এসেছে। প্রাচীন যুগের অনেক-গুলি আচার-ব্যবহার এবং সংস্কার ক্রমশঃ বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ হারাকিরি, উল্কি-পরা, তরবারি-বহন, বেণীধারণ ইত্যাদির কথা উল্লেখ করা যায়। দীর্ঘকাল যাবৎ জাপানের সামাজিক জীবনে হারাকিরির একটা মহান্ মর্যাদা ছিল। কোন জাপানী অপমান বোধ করে নিজের পেটের মধ্যে তরবারি ঢুকিয়ে দিয়ে আত্মহত্যা করত—এইভাবে আত্ম-হত্যা করার নামই হারাকিরি। এ প্রথা অনেকটা লুপ্ত হয়ে গেলেও একেবারে লোপ পায়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অনেক জাপানী বীরপুরুষই হারাকিরি করে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। পূর্বে প্রত্যেক জাপানীই তরবারি বহন করত, কিন্তু পরে আইন করে তা' বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

তোমরা অনেকেই বোধ হয় জংলী বা বুনোদের দেহে চিত্র-বিচিত্র দেখে থাকবে। দেহের চামড়ার উপর খোদাই করে নক্সা কাটাকে উল্কি-পরা বলে। পূর্বে জাপানীরা উল্কি পরতে খুবই অভ্যস্ত ছিল—বর্তমানে এ প্রথা প্রায় লোপ পেয়েছে। আগে পুরুষরাও মাথায় এক অদ্ভুত ধরনের লম্বা চুল রাখত—এখন আর তাও নেই। আমাদের দেশে নিম্নশ্রেণীর মেয়েরা দাঁতে কালো মিশি পরে থাকে হয়তো দেখে থাকবে। জাপানী

মেয়েরাও আগে রং দিয়ে দাঁত কালো করে রাখত—এখন অবশ্য আর তা' করে না।

মৃতের প্রতি জাপানীদের শ্রদ্ধা অসাধারণ। তারা কখনই মৃত ব্যক্তিকে ভুলে যায় না—এমন কি মৃত্যুর পরও মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে নানাপ্রকার উপহার, উপাধি বা সম্মান উৎসর্গ করা হয়। প্রতি বৎসর গ্রীষ্মকালে একদিন মৃত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। নানাপ্রকার পাখা, পতাকা ও আলোকমালা দিয়ে সমাধিস্থলকে সজ্জিত করা হয় এবং মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে নানাপ্রকার উপহার প্রদত্ত হয়।

## আমোদ-উৎসব

জনসাধারণের আমোদ-উৎসবে এখনও পর্যন্ত পাশ্চাত্য সভ্যতা খুব বেশি প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। চিরন্তন প্রথায় এখনও তাদের গ্রাম্য বা পল্লী উৎসবগুলো অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। নৃত্য ও সংগীত সাধারণতঃ দুইটি শ্রেণীর মধ্যেই সীমা-বদ্ধ—নাচ-গানকেই জীবনের উপজীবিকারূপে গ্রহণ করেছে, এ ধরনের মেয়েদের বলে 'গেইসা'। ,জাপানী বাদ্যযন্ত্রে কিছু কিছু পাশ্চাত্য প্রভাব পড়লেও প্রধানতঃ প্রাচীন যুগের যন্ত্র-গুলোই প্রাধান্য লাভ করেছে।

জাপানে 'কথক' বলে একপ্রকার বৃত্তিজীবী আছে—গল্প বলাই এদের পেশা। প্রতি সন্ধ্যায় গল্প শোনা এবং পুষ্প-মেলায়

যাওয়া—এই দুইটাও জাপানীদের প্রধান বৈকালিক আকর্ষণ। এ ছাড়া বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আমোদ-প্রমোদ তো আছেই। এদের মধ্যে প্রধান নববর্ষ উৎসব। বহু অদ্ভুত আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জাপানে নববর্ষ দিবস উদ্‌যাপিত হয়। এদের প্রত্যেকটি উৎসবের সঙ্গেই ধর্মীয় যোগাযোগ বর্তমান রয়েছে। প্রতি বছর ৩রা মার্চ তারিখে বিশেষভাবে মেয়েদের জন্যে একটা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। আবার ১লা মে তারিখে যে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, তাতে বিশেষ ভাবে ছেলেদেরই মাত্র যোগদানের অধিকার রয়েছে। এ ছাড়া আরও সংখ্যাতীত উৎসব সেখানে অনুষ্ঠিত হয় যার হিসেব দেওয়া দুষ্কর।

ঘুড়ি-ওড়ান, ভেল্কীবাজী, ধনুর্বিদ্যা এবং জুজুৎসু—জাপানের অতি প্রাচীন এবং প্রিয় ক্রীড়ানুষ্ঠান। জুজুৎসু নামটিই জাপানী এবং জাপান থেকেই এটা বাইরে চালান গিয়েছে বলে বিশ্বাস করা চলে। এই অনুষ্ঠানগুলো উপলক্ষ্যে প্রচুর লোক জমে।

জাপানী নাটকে এতকাল পর্যন্ত পুরুষদেরই একচেটে অধিকার ছিল। কিন্তু বর্তমানে কিছু কিছু অভিনেত্রীও নাটকে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করছে দেখা যায়। জাপানী নাটকের বৈশিষ্ট্য—এগুলো দিবাভাগে অনুষ্ঠিত হয়। সকাল বেলা আরম্ভ হয় এবং কখন কখন একটানা সন্ধ্যা পর্যন্ত চলতে থাকে। সাধারণতঃ উচ্চ স্তরের লোকেরা দীর্ঘকাল পর্যন্ত অভিনয় দেখতে

যেতেন না, এমন কি দর্শকদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যাও ছিল একেবারেই নগণ্য।

মেয়েরাই এই সমস্ত নাটক দেখবার জন্যে উপস্থিত থাকেন। তবে 'নো' বলে একপ্রকার অভিনয় আছে যা' সমাজের উচ্চস্তরের লোকেরাও সাগ্রহে উপভোগ করে থাকেন। এই 'নো' অভিনয় শিণ্টো ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত। আমাদের দেশের যাত্রাগান যেমন খোলা জায়গায় অনুষ্ঠিত হয়, 'নো' ও তেমনি খোলা জায়গায় অনুষ্ঠিত হয়। তার বিষয়বস্তুও অনেকটা আমাদের পৌরাণিক নাটকের মত। ধর্মীয় উৎসব-উপলক্ষ্যে অনেক সময় বড় বড় রাস্তার মোড়ে 'নো' অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

জাপানের বালক-বালিকাদের শৈশবকাল পৃথিবীর যে কোন দেশের বালক-বালিকাদের ঈর্ষা জাগাতে পারে। পৃথিবীর অপর কোনও দেশের পিতামাতা বা অভিভাবকরা—ছেলে-মেয়েদের প্রতি এতটা দৃষ্টি দেন না। জাপানের পিতামাতা অতি শৈশব থেকেই ছেলে-মেয়েদের আত্মসংযম এবং ভদ্রতা-বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। যাতে সর্বক্ষণ তাদের মুখে হাসি থাকে, কাজে রুচি থাকে এবং ভদ্রতা ও সুরুচিবোধের অভাব না থাকে—এই শিক্ষাই ছেলেরা বাল্যকাল থেকে পেয়ে আসে।

এই কারণেই সম্ভবতঃ জাপানী শিষ্টাচার জগতের চোখে এত প্রশংসা পেয়ে থাকে। জাপানে স্বার্থপর, অলস এবং

বখাটে ছেলে-মেয়ে প্রায় দেখতেই পাওয়া যায় না। তাদের শিক্ষার যেমন প্রচুর ব্যবস্থা তেমনি খেলাধূলারও প্রাচুর্য রয়েছে। লাটিম, ঘুড়ি আর নকল-গ্রাম তৈরী—এগুলো ছেলেদের অতি প্রিয় জিনিস।

এ ছাড়া মেয়েদের পুতুল-উৎসব একটা অপূর্ব ব্যাপার। সেদিন পুরুষানুক্রমে রক্ষিত-পুতুলগুলোর প্রদর্শনী হয় এবং মেয়েরা নানাপ্রকার উপহার পেয়ে থাকে। তেমনি ছেলেদেরও আছে পতাকা-উৎসব—তারাও সেদিন নানাপ্রকার উপহার পায় ও ক্রীড়ামত্ত থাকে।

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত জাপানীদের নিকট একটা ভাষা থাকলেও তারা লিখতে জানত না কিংবা তাদের নিজস্ব কোন লিপি ছিল না। তারপর কোরিয়ার সংস্পর্শে এসে তারা চীনা লিপি গ্রহণ করে তাকে নিজের সুবিধে মত গড়ে তুলল। বর্তমানে জাপানে একটা চলতি ভাষা আছে, তা' হল খাঁটি জাপানী আর চীনা-জাপানী ভাষার সংমিশ্রণে তৈরী। দুটো আছে লিখিত ভাষা—একটা খাঁটি জাপানী আর একটা চীনা-জাপানী মিশ্রিত। জাপানী সাহিত্যও দু'ধরনের—একটা খাঁটি প্রাচীন জাপানী ধরনে আর একটা চীনের ধরনে তৈরী। জাপানে প্রাপ্ত প্রাচীনতম গ্রন্থ বোধ হয় খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে রচিত হয়।

প্রাচীনকালে বিশেষতঃ তোকুগাওয়া শাসনকালে জন-

সাধারণের শিক্ষার জন্যে কোনপ্রকার সরকারী ব্যবস্থা ছিল না। বেসরকারী বিদ্যালয়ই ছিল শিক্ষার একমাত্র প্রতিষ্ঠান। তবে সামুরাইদের সুবিধের জন্যে সরকার থেকে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কিছু বন্দোবস্ত ছিল। পরবর্তী কালে অভিজাতদের অর্থ-সাহায্যে কিছু কিছু কলেজ স্থাপিত হয়েছিল। মেইজী শাসনকাল থেকে পাশ্চাত্যের অনুকরণে শিক্ষা-ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজা হয়েছে। বর্তমানে শিক্ষা হয়েছে সার্বজনিক ও আবশ্যিক। শিক্ষার প্রথম স্তরে কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী ও তারপর প্রাথমিক বিদ্যালয়। নিম্ন প্রাথমিক স্তরে ছয় বৎসর ও উচ্চ প্রাথমিক স্তরে দু' বৎসর পড়বার পর যেতে হয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে—সেখানে পাঠকাল পাঁচ বৎসর। তারপর তিন বৎসর উচ্চতর বিদ্যালয়ে পড়বার পর সুযোগ আসে বিশ্ববিদ্যালয়ে অথবা উচ্চতর কোন বৃত্তি শিক্ষালয়ে প্রবেশ করবার।

মেয়েরাও ছেলেদের সমান শিক্ষাই পেয়ে থাকে। সাধারণ শিক্ষা ছাড়া আইন, পূর্তবিদ্যা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, কৃষি প্রভৃতিতে উচ্চতর শিক্ষা লাভের সুযোগও জাপানে রয়েছে। ফলে জাপান শিক্ষা-দীক্ষায় আজ পাশ্চাত্যের সমকক্ষত্ব দাবী করতে পারে। জাপানে অশিক্ষিত নেই বললেই চলে।

জাপানের প্রাচীনতম ধর্ম শিণ্টো। এর বিশেষ কোন রূপ নেই, তবে পূর্বপুরুষ ও প্রকৃতি পূজা এবং সম্রাট্‌কে দেবজ্ঞানে পূজা করাই এ ধর্মের প্রধান লক্ষণ। খ্রীষ্টীয় সপ্তম

## জাপান—

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গকে স্তম্ভিত করে তুলেছিল দুর্ধর্ষ জাপান—একটার পর একটা দেশ জয় করে। কে ছিলেন সেদিন তাদের কর্ণধার? —প্রধান মন্ত্রী তোজো। অবশ্য নিয়তির ক্রূর পরিহাসে শেষ পর্যন্ত তাঁকেও বিদেশী শত্রুর হাতে চরম দণ্ড লাভ করতে হয়।

শতকে এদেশে প্রথম বৌদ্ধ ধর্মের আগমন হয় এবং দিন দিন তার প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব বাড়তে থাকে। তবে জাপানের বৌদ্ধ ধর্ম অন্য স্থানের বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে মেলে না। পরে কনফুসিয়সের ধর্মও কিছু কিছু বিস্তৃতি লাভ করে। অষ্টাদশ শতক থেকে শিণ্টোধর্মকে পুনরায় উজ্জীবিত করার দিকে ঝোঁক দেখা যায় এবং পরে তা' রাজধর্ম বলে স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

পাশ্চাত্যের প্রভাবে জাপানে খ্রীষ্ট ধর্মেরও যথেষ্ট প্রসার লাভ ঘটেছে। তবে জাপানীদের ধর্ম সম্বন্ধে কোনই গোঁড়ামি নেই—এইটেই আশ্চর্যের কথা। একই পরিবারে শিণ্টো, বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টান বর্তমান রয়েছে—কোনও প্রকার মনোমালিন্য নেই। একই বেদীতে একজন শিণ্টো পূজো করছে, এবং একজন বৌদ্ধও উপাসনা করছে—এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

জাপান সভ্যতা-সংস্কৃতির অনেক ক্ষেত্রেই যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখিয়েছে—তাদের মধ্যে বিশেষভাবে চিত্রশিল্পের উল্লেখ করা আবশ্যক। অলংকার বা সাজ-সজ্জার ক্ষেত্রে তো বটেই, এমন কি দৈনন্দিন জীবনের টুকিটাকিতেও শিল্পের পরশ দেখতে পাওয়া যায়। পৃথিবীর কোথাও এত শিল্প-পাগল জাত দেখতে পাওয়া যায় বলে মনে হয় না।
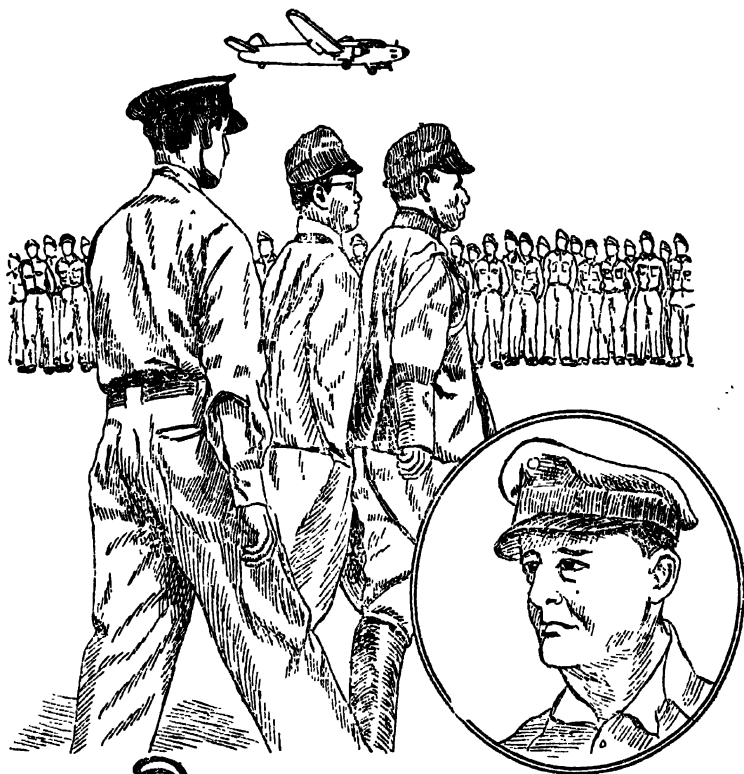
# স্বাধীন জাপান

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান পরাজিত হবার পর থেকে প্রায় সাত বৎসরকাল তাদের আর কোন স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রইল না। মিত্রশক্তির নামে মার্কিনী জঙ্গীবাদই এতদিন জাপানে শাসন করেছে। ম্যাকআর্থারী শাসনব্যবস্থাকে জাপানীরা দীর্ঘকাল

মনে রাখবে। ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দে ৮ই সেপ্টেম্বর সান্‌ফ্রান্সিস্কোতে জাপ শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দের ২৮শে এপ্রিল জাপানের সঙ্গে শান্তিচুক্তি কার্যকরী করা হয়েছে। এই শান্তিচুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে পৃথিবীর আটচল্লিশটি দেশ। ভারত, ব্রহ্মদেশ ও যুগোস্লাভিয়া এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে যোগদান করে নি—তবে ভারত ঐ তারিখেই অন্যান্য সব দেশের মতই স্বতন্ত্রভাবে জাপানের সঙ্গে যুদ্ধাবস্থার অবসান ঘোষণা করেছে এবং পরে পৃথক্‌ভাবে জাপানের সঙ্গে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করেছে। পোল্যাণ্ড ও চেকোস্লাভেকিয়ার সঙ্গে সোভিয়েট য়ুনিয়ন ঐ সম্মেলনে উপস্থিত হয়েও শান্তিচুক্তিতে স্বাক্ষর করেনি। কম্যুনিস্ট চীন অথবা চিয়াং-সরকার এই সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয় নি। তা'হলে মোটামুটিভাবে বলা চলে যে যুদ্ধ হবার পরও সাত বছর ধরে জাপানের সঙ্গে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের যে যুদ্ধাবস্থা চলছিল, ঐ চুক্তির সঙ্গে সঙ্গে তার অবসান ঘটেছে।

জাপানের জাতীয় জীবনের সুদীর্ঘ ইতিহাস ছিল অকলঙ্কিত। বিগত আড়াই হাজার বছর ধরে জাপান স্বীয় স্বাধীন সার্বভৌমত্ব বজায় রেখেছিল—কোন বিদেশীর পদানত হবার দুর্ভাগ্য তার হয়নি। এই সুদীর্ঘ অকলঙ্কিত জীবনে কলঙ্কের রেখা পড়ল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানে।

সাত বৎসর কাল পরাধীনতা ভোগ করে জাপান আবার

বিশ্বসভায় মর্যাদার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হল। ম্যাকআর্থারী শাসনব্যবস্থার লোপ পেল।

শান্তিচুক্তি অনুসারে জাপানে মার্কিন সৈন্য অবস্থান করবে, থাকবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌঘাঁটি ও বিমান-ঘাঁটি। কতকাল তাদের স্থায়িত্ব, কেউ বলতে পারে না। এই মার্কিন সৈন্যদের উপর জাপ-গভর্নমেণ্টের কোনরূপ নিয়ন্ত্রণাধিকার থাকবে না, জাপানের আইন-কানুনও খাটবে না। পররাষ্ট্রনীতিতে এমন কি আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থায়ও জাপান স্বেচ্ছামত কাজ করতে পারবে কিনা সন্দেহ। কারণ জাপানের এই স্বাধীনতকে বলা চলে মার্কিন-তাঁবেদারী স্বাধীনতা। জাপানের সর্বসাধারণ যে এই চুক্তিকে সর্বান্তঃকরণে বরণ করতে পারেনি, তার প্রমাণ—চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার তিনদিনের মধ্যেই, ১লা মে তারিখে মে দিবসে জাপানে যে ব্যাপক গণবিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল, তাকে দমিয়ে দেবার জন্যে ২৫ হাজার জাপানী পুলিসের সঙ্গে মার্কিন-সৈন্যবাহিনীকেও ডাকতে হয়েছিল। আর সেদিনকার সংঘর্ষে প্রায় আঠার শত নরনারী আহত হয়েছিল।

পৃথিবীর প্রায় সব দেশের সঙ্গেই জাপানের শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে—কিন্তু যাদের সঙ্গে প্রকৃতই তার শান্তি স্থাপিত হওয়া দরকার, তাদের সঙ্গেই আজ পর্যন্ত কোন চুক্তি সম্পাদিত হয় নি। জাপানের নিকটতম দেশ—চীন ও

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা মানুষের মস্তকে অজস্রধারায় বর্ষণ করেছে যেমন আশীর্বাদ, তেমনি তার জীবনকে নানাভাবে করে তুলেছে অভিশপ্তও। আণবিক বোমা বিজ্ঞানেরই একটি দানবীয় রূপ। রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে আজ প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছে সর্বধ্বংসী মারণাস্ত্র আবিষ্কারে!
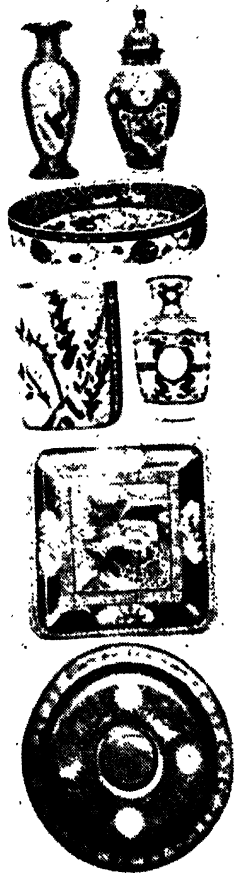
মাত্র ক্ষাত্র দ্বন্দ্বেই জাপানীরা তাদের সমস্ত শক্তিকে ব্যয়িত করে নি—বিচিত্র শিল্প-সম্ভারেও তারা তাদের দেশকে করে তুলেছে সমুন্নত। জগৎ-সভায় তাই সে পেয়েছে সার্থক আসন।

সোভিয়েট য়ুনিয়ন। পূর্ববর্তী কালে জাপানের সঙ্গে এই দু'টি দেশেরই একাধিকবার করে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে—আর তা' ছাড়া এ দু'টি দেশই প্রবল প্রতিপক্ষ। কাজেই এদের সঙ্গে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত না হওয়া পর্যন্ত জাপানের নিরাপত্তা সন্দেহাতীত নয়। কম্যুনিস্ট চীনের সঙ্গে জাপান একটা বোঝা-পড়ায় আসতে চায়, কিন্তু বর্তমান মার্কিন সরকার সে ব্যাপারে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে জাপান রাষ্ট্র-সংঘের সদস্য নির্বাচিত হয়েছে।

যুদ্ধোত্তরকালে জাপানই ছিল সমগ্র প্রাচ্যের প্রবলতম শক্তি। এসিয়াবাসীকে যদি পাশ্চাত্যের সমকক্ষ কোনও জাতির কথা উল্লেখ করতে হত, তবে সগর্বে সে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিত জাপানকে। আজ মহতের পতন হয়েছে—তা' নিয়ে আমাদের আনন্দ করবার হেতু নেই। আমরা সাগ্রহে প্রতীক্ষা করব, জাপান আবার নবীন উৎসাহে উজ্জীবিত হয়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পূর্ব স্থানে প্রতিষ্ঠিত হোক্, তাতে তারও মঙ্গল, আমাদেরও মঙ্গল।

সমাপ্ত